

চতুর্থ অধ্যায় উৎপল দত্তের নাটকের সাহিত্যমূল্য

রাজনৈতিক নাটক : উৎপল দত্ত নিজেকে নাট্যকার অপেক্ষা ‘প্রোপাগাণ্ডিস্ট’ বলতে পছন্দ করতেন। নাটক তাঁর কাছে ছিল মতবাদ প্রচারের মাধ্যম। উৎপল দত্ত রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে ছিলেন মার্কসবাদী। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে এই মতবাদ তিনি প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন। এদিক থেকে তাঁর নাটকগুলিকে রাজনৈতিক নাটক বলা যায়। রাজনৈতিক নাট্যশালার পথিকৃৎ যাকে বলা হয় সেই আরউইন পিসকাটর নিজে বলতেন শিল্প সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। উৎপল দত্ত এ কথা একই ভাবে বলতেন। তাঁর আর এক নাট্যগুরু বার্টোল্ট ব্রেখট্ মনে করতেন ‘মার্কসবাদী না হলে ভালো নাটক লেখা যায় না।’ উৎপল দত্ত এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। কাজেই একটি লক্ষ্য বা অভিপ্রায়কে সামনে রেখে উৎপল নাটক লেখা ও প্রযোজনা করে গেছেন। তিনি নাটক লেখার কাজে যোগ দিয়েছিলেন কোনো সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা থেকে নয়। তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন “আমি আদৌ নাট্যকার নই, কিন্তু একজন পরিচালক হিসেবে আমি যে ধরণের নাটক করতে চাই সে রকম নাটক পাই না (অবশ্য ধ্রুপদী নাটক ছাড়া)। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে নিজের প্রয়োজনানুগ নাটক লিখে নিতে হয়।”^১ নাট্যকার হিসেবে না হলেও পরিচালক হিসেবে নিজের ভূমিকাকে আদৌ খাটো করে তিনি দেখতেন না। সে বিষয়ে তাঁর দাবী ছিল সর্বাধিক। তাঁর প্রযোজনা বাংলা নাট্যক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। ‘অঙ্গারে’ খনির দৃশ্য, ‘কল্লোলে’ নাট্যক্ষেত্রে জাহাজ আনানো, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ নাটকে দর্শকের গ্যালারি পর্যন্ত বিস্তৃত র‍্যাম্প, ক্ষেত্রে মেলার দৃশ্য—এসব তাঁর পরিচালনার বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার হিসেবে তাঁর আধুনিকতা প্রসঙ্গে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— তাঁর নাটকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তা ধরা পড়েছে।^২ কাজেই উৎপল দত্ত অত্যন্ত সচেতন ভাবে এবং সময় ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং তাকে নাট্য আঙ্গিকে রূপায়িত করার কাজটি করে গেছেন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে জিগ্যেস করেছিলেন “এইপর্বে (বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় আসার সময়) আপনি কি সচেতন ভাবেই এই সিদ্ধান্ত নেন জনসাধারণকে বৌদ্ধিক স্তরে চিন্তা ও আস্থার রসদ জোগান দিয়ে ওই রাজনৈতিক ধারাকে মদত দেওয়াই এবার আপনার দায়িত্ব হয়ে

দাঁড়াবে?”^{৩০} উৎপল বাবু এর জবাবে বলেছিলেন—“নিশ্চয়ই, কেননা ইতিহাসের পর্যালোচনা, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে না দেখলে পরে, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বর্তমানকেও দেখা যায় না। এটা আমরা বিশ্বাস করি।”^{৩১} কাজেই জনসাধারণের বৌদ্ধিক স্তরের উৎকর্ষ সাধন, তাকে চিন্তার দিক থেকে বৈপ্লবিক করে তোলার কাজ উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের মাধ্যমে করেছেন। এ কাজে নাটক তাঁর মাধ্যম কিন্তু ‘সাহিত্য গুণ সম্পন্নতা’ বলতে সাধারণত যা বোঝায় উৎপল তার দিকে ততোটা মনোযোগী ছিলেন না—যতটা ছিলেন তাঁর বক্তব্য প্রচারের ক্ষেত্রে। তার অভিনয়ের সহকর্মীরা বলেছেন নাটকের লিখিত script তাঁর কাছে একটা রেখাচিত্রের মতো থাকতো, লিখিত বাক্যগুলোই তাঁর কাছে নাট্য নয়। পরিচালনার সময় তার অনেক রদবদল ঘটে যেত। তাছাড়া অভিনয়ের ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জা স্বরক্ষেপ, আলোক সম্পাত ইত্যাদি বিষয়গুলি নাট্যকাহিনী ও সংলাপের সঙ্গে একীভূত হয়ে যে বস্তুটি সৃষ্টি করত তাই ছিল তাঁর নাটক।

উৎপল দত্ত তাঁর নাটককে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুললেও তা সাহিত্যগুণে ভরপুর হয়ে উঠেছে। নাট্যকার যে মতাদর্শে পুষ্ট হয়েছেন, মার্কসবাদ লেনিনবাদকে জীবনের আদর্শ করে তিনি যে ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনকে লক্ষ্য করেছেন, সমকালের প্রেক্ষাপটে তিনি তারই বিশ্লেষণ করেছেন এবং এর জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাকে অবলম্বন করেছেন তাঁর নাট্যকাহিনীতে।

নাট্যকারের মতাদর্শ—“মানুষকে শিল্পের মাধ্যমে আনন্দ দাও, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই তাকেই মার্কস্বাদে, লেনিনবাদে দীক্ষিত করো। উদ্বুদ্ধ করো।”^{৩২} এই আনন্দময় পরিস্থিতির মাধ্যমেই নাট্যকার তাঁর নাট্য উদ্দেশ্যকে জনমানসে গ্রহণযোগ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। আর এভাবেই নাটক ও থিয়েটারের মাধ্যমে জনসংযোগ ও জনসচেতনতা বাড়াতে চেয়েছেন।

তাঁর নাটকের মধ্যদিয়ে তিনি মানুষের কথা বলেছেন, মানুষের সমস্যা ও সংকট দেখাতে চেয়েছেন, যেন দর্শক বা পাঠক একত্রিত হয়ে সেই সমস্যা বা সংকটকে নিজের সংকট বা সমস্যা বলেই মনে করে। নাটক ও থিয়েটার জনসাধারণের মনে সেই চেতনাকেই জাগ্রত করে। যার ফলে একত্রিত দর্শক বা পাঠক জীবন ও সমাজসমস্যাকে বুঝে নিয়ে দলবদ্ধ ভাবে তার প্রতিকারের চেষ্টা করে।

মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় থেকেই তিনি বাণিজ্যিক থিয়েটারের সঙ্গে লড়াই করে নিজের ও নাট্য দলের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন কারণেই বাণিজ্যিক বিচ্যুতি গুলির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেননি। তবে নাটকের মধ্যে তিনি মানুষের জন্য চিন্তা ও আনন্দের পসরা সাজিয়েছেন। যাতে করে বাণিজ্যিক থিয়েটারের সাধারণ দর্শক তাঁর

নাটক দেখে। নাটক যদি সাধারণ জনগণ না দেখে তা হলে নাটকের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার কোন উপায় থাকে না। সে কারণেই উৎপল দত্ত তাঁর নাটক জমিয়ে দিতেন নানা উপাচারে, নাট্যঘটনায়, নাট্যদ্বন্দ্বের মুহূর্তে, রসিকতায়, চরিত্রের আচরণ ও সংলাপের ম্যানারিজমে। তাছাড়াও এর সঙ্গে ছিল তাঁর নাট্যদলের কুশীলবদের অসামান্য অভিনয় কুশলতা। নাট্যকারের উদ্দেশ্যই হল,—

“প্রথমে আনন্দ দাও, আনন্দের মাধ্যমে দর্শককে শিক্ষা দাও এবং ক্রমে তার চেতনার বিকাশ ঘটানো। যাতে রাজনৈতিক দলের সমাজ বদলের লড়াইয়ে এই চেতনাসম্পন্ন দর্শকেরা গণজাগরণের ভূমিকা পালন করতে পারে। কী, কেন এবং কাদের জন্য নাটক - এই ত্রিবিধ দায়িত্ব মাথায় রেখে উৎপল দত্ত নাট্যকর্মী হিসেবে তাঁর প্রোপাগান্ডিস্ট-এর ভূমিকা পালন করে গেছেন।”^৬

নাট্যকার জানিয়েছেন—“রোজকার বেঁচে থাকার লড়াই নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ, ক্রোধ, সংগ্রাম আমার লেখা নাটক ও কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয় বলে জনসাধারণের ভালো লাগে।”^৭ এসব নাটকের মধ্যদিয়েই মানুষের কথা, সমাজের কথা এবং সর্বোপরি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কথা নানা ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তিনি।

শিল্পের জন্য শিল্প নয়, মানুষের জন্যই শিল্প- এ বিশ্বাসে সারাজীবন বিশ্বাসী ছিলেন উৎপল দত্ত। তিনি বলেছেন—“আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোনও আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগান্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়।”^৮ নাট্যজীবনের শুরু থেকেই উৎপল দত্ত সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামকে তাঁর নাটকের মূল বস্তু করে তুলেছিলেন। এজন্য তিনি পৃথিবীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা পর্বে অভিযান করেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম, জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নানা আর্থিক অধিকার ও মানবিক স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম এ সব কিছুই তাঁর কাছে এক ও অব্যাহত সংগ্রামের নানা স্থানিক ও কালিক বিস্ফোরণ, যে কোন সংগত সংগ্রামই অন্য ন্যায্য সংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে এবং তা শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেঁলার লড়াই, বাংলার সন্ত্রাসবাদ এবং শ্রমিক ধর্মঘট ও খাদ্য আন্দোলনে মানুষের তীব্র ধিক্কার- প্রতিবাদকে উৎপল দত্ত একই বৃহৎ ও দেশকাল পরিব্যাপ্ত উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে তাঁর নাট্যকর্মে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে থাকেন। একাজ যতটা নাট্যকারের ঠিক ততটাই একজন ‘প্রোপাগান্ডিস্টের’।^৯

উৎপল দত্তের কাছে “নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার।”^{১০} কিন্তু এ সংগ্রামের কথা থাকলেও দর্শক বা পাঠকমনকে তিনি শিল্পকৌশলে আনন্দ দানের মাধ্যমে নাট্য উদ্দেশ্যকে বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন। উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে দর্শক বা পাঠকমনের বিরক্তিকে প্রশয় দেননি বরং কৌশলে বোঝাতে চেয়েছেন। নাটকের যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেটা যেন দর্শক বা পাঠক নিজের মনে করে এবং তা সমাধানের জন্য সমবেত প্রতিরোধ তৈরী করে।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বলেছিলেন—“নিছক রাজনীতি প্রভাবিত কোন শিল্প কর্মই কিন্তু শিল্পের পর্যায়ে ওৎরাবে না।”^{১১} আর সে কারণেই হয়তো গণনাট্য সংঘে একসময় ভাঙন দেখা দিয়েছিল এবং নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। গণনাট্য ভেঙে তৈরী হল গ্রুপ থিয়েটার। জীবনের বিস্তার অনেক ব্যাপক এবং গভীর। নবনাট্য সেই ব্যাপকতার দিকেই এগিয়ে গেছে। তবে রাজনৈতিক মতবাদের প্রচার নবনাট্যের উদ্দেশ্য না হলেও তা একেবারেই রাজনীতি বিবর্জিত ছিলনা। সেখানে রাজনীতি তথা প্রতিবাদী চেতনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের দিকটিকেও প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা ছিল।

ফল স্বরূপ দেখা যায় পঞ্চাশের দশকে উদ্ভূত গ্রুপ থিয়েটারগুলি নতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে একটা নতুন আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। নাটকে প্রতিরোধের একটা আবহ থেকেই গেল, গণনাট্য সংঘের যে রাজনৈতিক আদর্শ সেটাকেও অস্বীকার করা হল না। তবে নাটককে আরো কিভাবে শিল্প সম্মত করা যায় তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলল। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রভূমি ক্রমশ বিস্তৃত হল গ্রুপ থিয়েটারকে অবলম্বন করেই। উৎপল দত্তের এল.টি.জি এরকমই একটি অন্যতম গ্রুপ থিয়েটার। এই গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রচার তথা নাট্যোদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি উৎপল দত্ত শিল্পকলাকে উপেক্ষা করেননি। বরং শিল্প নৈপুণ্যের সঙ্গে নাটকের প্রচারমূল্যের পাশাপাশি সাহিত্যমূল্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নাটকে সাহিত্যমূল্যও বর্তমান—

“এত বেশি নাটক লিখেছেন যে ব্যক্তি, এত শয়ে শয়ে চরিত্র ও ঘটনা তৈরী করে যিনি এক নাটকীয় ও বৈপ্লবিক বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, তাঁর নাটকে নিজের অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তির অভাব আমাদের বিস্মিত করে। একই সঙ্গে বেদনা ও হাসির ওপর ছিল তাঁর সমান দখল, বহু মানুষের বিচিত্র জীবনলীলার একটা বিশ্বাসযোগ্য জীবন্ত ছবি তাঁর নাটকে আমাদের চোখের সামনে দুলতে থাকে। ফলে তাঁকে পড়তে পড়তে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়, কখনই তিনি একঘেয়ে হয়ে পড়েন না।”^{১২}

নাটকের গঠনশৈলী, সংলাপ রচনার দক্ষতা, সঙ্গীতের ব্যবহার, নাট্যদ্বন্দ্ব ও নাট্যোৎকর্ষা রচনা, চরিত্র নির্মাণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

উৎপল দত্তের নাটকের সাহিত্যমূল্য ও প্রচারমূল্যের ব্যাখ্যা করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা এ বিষয়গুলির যথাযথ রচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর সাহিত্যমূল্য যা তাঁর নাট্যোদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একজন শিল্পী হিসেবে প্রথমে তিনি তাঁর নাটকের শিল্পগুণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে তাঁর নাটকগুলি রচিত। তাই প্রতিটি নাটকে নাট্যকারের অভিপ্রায় রয়েছে ঠিকই কিন্তু তাকে তিনি নাট্যগুণমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে কাহিনী রচনার পারিপাট্য ছাড়াও আঙ্গিকের ব্যবহারে তিনি অভিনবত্ব এনেছেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন নাটকের কাহিনী, চরিত্র, দৃশ্য, সঙ্গীত সব ক্ষেত্রেই তিনি এ নূতনত্ব নিয়ে আসেন। নাটকের আঙ্গিককে তিনি ধারালো অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছেন।^{১৩}

উৎপল দত্ত নিজের নাটকে এবং তার মঞ্চায়নে একটি লক্ষ্যকেই সামনে রেখে চলেছিলেন। তাঁর নাটক হবে বিপ্লবের আগমনী। তাঁর এ চিন্তা নিজের দার্শনিক প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উৎপল দত্ত দর্শনের গোড়া থেকে শুরু করে মার্কসবাদে পৌঁছেছিলেন, মার্কস, লেনিন, ট্রটস্কি, বুখারিন, মাও, লিনপিয়াও, গ্রামসি সবই পড়েছিলেন। কাজেই বিপ্লবী থিয়েটারের ধারণাটা তাঁর তাত্ত্বিক ও ইতিহাসবোধের উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে এ বিষয়ে তিনি আরউইন পিসকাটারের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগিয়েছিলেন। পিসকাটারের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে ‘রাজনৈতিক নাট্যশালার জনক’ হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

আরউইন পিসকাটার ছিলেন জার্মানীর বিখ্যাত নাট্য পরিচালক, তাঁকেই রাজনৈতিক নাট্যশালার পথিকৃৎ বলা হয়। পিসকাটার নিজের নাট্যকর্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন “আমি শিল্প সৃষ্টি করতে আসিনি, ব্যবসা করতেও নয় ... যে থিয়েটারের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব সে-থিয়েটার হবে বৈপ্লবিক (অবশ্যই ব্যবসায়িক সীমার মধ্যে) অথবা কিছুই নয়।”^{১৪} এই উক্তিটি যেমন ‘পিসকাটার : রাজনৈতিক নাট্যশালার জনক’ প্রবন্ধে তিনি উদ্ধৃত করেছেন তেমনি ‘Towards A Revolutionary Theatre’ বই এর ‘Political Theatre’ প্রবন্ধের উপরেও মুদ্রিত করেছেন। পিসকাটারের নাটক সেকালের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি বিশুদ্ধ শিল্পগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাঁর বিরুদ্ধে ‘ইতিহাস বিকৃতির’ অভিযোগ এনেছিল। পিসকাটার লিখেছিলেন তাঁর ‘বিশ্ববীক্ষা’ আর শৈল্পিক প্রকাশের মধ্যে ‘কার্যকারণ সম্পর্ক’ আছে, আর সেটাই কাগজগুলো বোঝেনি। উৎপল দত্ত এই প্রসঙ্গের সার সংগ্রহ করে লিখেছেন—“পিসকাটারের ফর্ম তাঁর কমিউনিস্ট রাজনীতি থেকে প্রসূত।”^{১৫} তাঁর নাট্যচিন্তার মূলে আছে তাঁর রাজনীতি। উৎপল দত্তের নাটক এবং তাঁর মঞ্চ উপস্থাপনা দুয়ের মূলেই আছে তাঁর রাজনীতি; এবং মনে হয় পিসকাটার এ বিষয়ে

তঁার পূর্বসূরীর ভূমিকা পালন করেছেন।

পিসকাটারের পরে উৎপল দত্তের নাট্যচিন্তার পিছনে আর যাঁর কথা স্মরণ হয় তিনি বার্টোল্ট ব্রেখট্। ব্রেখট্ সম্বন্ধে উৎপল দত্তের একটি প্রবন্ধের নাম ‘বেটেল্ট ব্রেখট্ ঃ কমরেড’। ব্রেখট্ মনে করতেন “মার্কসবাদী না হলে ভালো নাটক লেখা যায় না।”^{১৬} তঁারও লেখার মূল প্রেরণা ছিল তঁার রাজনৈতিক মতবাদ। রাজনৈতিক মতবাদ উৎপল দত্তের নাট্য রচনার মূল কথা। এ বিষয়ে ব্রেখট্ও তঁার পূর্বসূরী। কিন্তু আরও একটি ব্যাপারে উৎপল দত্ত এঁদের উত্তরসূরী। পিসকাটার এবং ব্রেখট্ এর থিয়েটার মানুষের আবেগ অনুভূতি নিয়ে ততটা চিন্তিত ছিলেন না, তঁারা মানুষকে ভাবাতে চেয়েছিলেন। এজন্য তঁাদের নাটকে সমাজ ও রাজনীতির প্রসঙ্গ বেশি গুরুত্ব পায়। উৎপল দত্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—“এ (ব্রেখট্‌র থিয়েটার) আমাদের কাঁদায় না, ভাবায়। মোহাবিষ্ট করে না, চিন্তার উদ্রেক করে। তন্দ্রাতুর করে না, সজাগ করে।”^{১৭} বলা প্রয়োজন উৎপল তঁার নাটকে এই গুণগুলিকে ধরবার কাজ করে গেছেন। এই কথা মনে রেখেই পবিত্র সরকার উৎপল দত্তের নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডের ভূমিকার প্রথম বাক্যে লিখেছিলেন—“উৎপল দত্ত একই সঙ্গে বাংলা নাট্যজগতের ব্রেখট্ ও পিসকাটার।”^{১৮} পিসকাটারের আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন তঁার কাজ “মঞ্চের ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের বৃহৎ শক্তিগুলির যোগসূত্রটা ধরা।”^{১৯} উৎপল দত্তের নাটকের শিল্পমূল্য বিচার করতে গেলে এই চিন্তাগত সূত্রগুলি মনে রাখা দরকার। উৎপল দত্ত নাটকের বিষয় হিসেবে যা বেছে নিয়েছিলেন তার সবগুলির মূল কথা ইতিহাসের গতিপথটিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোকিত করে তোলা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপলের নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে লিখেছেন—“নাট্যকার হিসেবে তিনি সবচেয়ে আধুনিক এই অর্থে, যে তঁার নাটকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তা ধরা পড়েছে। এ চিন্তা তঁার ইতিহাস চেতনার ফসল এবং এই ইতিহাস চেতনার ভিত্তি ছিল শ্রেণী সংগ্রাম।”^{২০} তিনি এ প্রসঙ্গে আরো লিখেছেন—

“তঁার রচিত নাট্য তালিকার দিকে তাকালেই নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটি সুস্পষ্ট চিন্তাধারার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীতের প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণবিপ্লবের কাহিনী তঁার নাটকের বিষয়বস্তু। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়াহাবি আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত অধ্যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের দুঃসাহসিক অধ্যায়, ভারতের নৌবিদ্রোহ, দেশ বিভাগের মর্মস্তুদ ঘটনা ইত্যাদি। এতো গেল দেশের

কথা—পাশাপাশি গোটা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের মরণপণ সংগ্রামের ঘটনাগুলিও তাঁর নাটকে ধরা পড়েছে, গভীর ইতিহাসবীক্ষার আলোকে। পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র গঠনের যে ঘটনা আজও সর্বহারাশ্রেণীর চোখের মণি, সে প্যারিসকম্যুন, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব ও উত্তরকাল, ফ্যাসি বিরোধী সংগ্রাম, চীনের বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ, কিউবা ইন্দোনেশিয়া, একান্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, এমনকী অতি সাম্প্রতিককালে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কলঙ্কজনক ভূমিকা—সবই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুতে।”^{২১}

উৎপল দত্তের নাট্যবিষয়ের কথা আমরা এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় তার সামগ্রিক রূপটি এখানে তুলে ধরা হল। তাঁর লেখায় উৎপল দত্তের নাটকের বিষয়বস্তুর পরিচয় সংক্ষেপে অথচ ঠিকভাবে ফুটে উঠেছে। 'Theatre as Weapon of revolution' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন এদেশে কমিউনিস্ট পার্টিই 'People's theatre-movement' শুরু করে। একথাও তিনি লিখেছেন revolutionary theatre-movement পার্টির প্রচারের সবচেয়ে জোরালো মাধ্যম।^{২২} এক সময় এই পার্টির প্রচারের কাজেই থিয়েটারকে ব্যবহার করা হত। "Many of our plays were mere canvassing for votes".^{২৩} কিন্তু ক্রমশ তিনি বুঝতে পারলেন কেবল পার্টির নির্দেশ মেনে চললেই ভালো নাটক হবে না। তিনি বুঝলেন "We have realized now that irrespective of party policy of the time every incident of heroism of the masses is material for drama".^{২৪} কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নানা আলোচনা ও বিতর্কের পর তিনি অনুধাবন করলেন "The revolutionary theatre must in all plays advance revolutionary ideology".^{২৫} কেবল যা ঘটছে তার বর্ণনাই নাট্যকারের কাজ নয়। তাঁকে এক ধাপ এগিয়ে চলতে হবে। "the revolutionary theatre must take a step forward and look into the future when it will be ripe, as it is inevitably will"^{২৬} এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের লেখা প্রবন্ধ 'পিসকাটর : রাজনৈতিক নাট্যশালার জনক' থেকে উদ্ধৃত করছি : "পিসকাটর ও ব্রেখট শুধু তথ্য চাননি, চেয়েছেন সত্য। এবং যা ঘটছে না কিন্তু ঘটা উচিত, ভবিষ্যতে ঘটবে, সেটাও সত্যের অংশ।"^{২৭} কাজেই বিপ্লবী থিয়েটারের লক্ষ্য মানুষকে মতাদর্শে দীক্ষিত করা, "give politics and ideology to the workers".^{২৮} এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যবিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন, নাটকের উপস্থাপনা করেছেন। উৎপলের রাজনৈতিক নাটকের অনন্যতা আলোচনা করতে গিয়ে হীরেন ভট্টাচার্য লিখেছেন

“উৎপলবাবু কোনো বাতাবরণে তাঁর রাজনৈতিক মতামতকে আবৃত করেননি। শাসক-শোষক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে তিনি তার নাটকে সোজাসুজি আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করেছেন।”^{২৯} উৎপল দত্ত যে নাটকগুলি লিখেছেন এবং মঞ্চস্থ করেছেন সেগুলি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই করেছেন। তাঁর কাজ ছিল মানুষের কাছে তাঁর বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এই কাজটাই তিনি তাঁর নানা ফর্মের নাটকের মধ্য দিয়ে করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন “মুক্তির একমাত্র উপায় বিপ্লব।”^{৩০} এজন্য পথনাটিকা, মঞ্চনাট্য, যাত্রা, অনুবাদ নাটক—সবই তিনি প্রয়োগ করেছেন। উৎপল দত্ত এই রাজনৈতিক নাটক করবার সময় নাটকের বিষয়বস্তুর উপর জোর দিয়েছেন বেশি। কেননা তাঁর কাছে রাজনীতি প্রচারের মাধ্যমই তো এই বিষয়। দেশ ও কালের ইতিহাস অন্বেষণ করে এই বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই নাটকে ধরে দিতে চেয়েছেন। দর্শক সাধারণকে বোঝাতে চেয়েছেন ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের পথ এই শোষক ও শোষিতের দ্বন্দের রক্ত পিচ্ছিল পথ। তাঁর নাটক রাজনীতি প্রচারের মাধ্যম—একথা তিনি সবসময় বলেছেন।

নাটকের বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দিলেও নাটকের আঙ্গিককে কিন্তু তিনি কখনো অবহেলা করেননি। বস্তুত নাট্যপরিচালক হিসেবেও নাটকের মঞ্চায়নে তিনি অনেক নতুনত্ব এনেছিলেন। প্রথম জীবনে আধুনিক পোশাকে ‘জুলিয়াস সীজার’ উপস্থাপনা করে তিনি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। নাট্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পিসকাটর বা ব্রেখট নানা অভিনবত্ব এনেছিলেন। তবে তিনি আঙ্গিকের অভিনবত্বের সঙ্গে বিষয়বস্তুর যোগ রক্ষা করার কথা বলতেন। তিনি লিখেছেন—
 থিয়েটারের ফর্মের সঙ্গে কনটেন্টের যোগসূত্র থাকবে। প্রতিটি নাটককেই তার নিজস্ব ফর্ম খুঁজে নিতে হবে।^{৩১} মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফর্মের বিচার প্রসঙ্গে র্যালফ ফক্সের একটি কথা স্মরণযোগ্য। “ফর্ম বা কনটেন্ট কোনটাই পরস্পর থেকে পৃথক এবং নিষ্ক্রিয় কোন সত্তা নয়। ফর্মকে তৈরি করে কনটেন্ট।”^{৩২} অবশ্য উৎপল দত্ত নাটকের বিষয়ে এবং মঞ্চ উপস্থাপনার কৌশলে দর্শক আকর্ষণের কাজ করতেই চাইতেন। ‘চায়ের ধোঁয়া’ বই এর একটি প্রবন্ধে তিনি পরিচালকের মুখে বলিয়েছেন—
 “জনপ্রিয়তার মুখে তুড়ি মারা সকলের পক্ষে সম্ভব, এক নাট্যকার ছাড়া।”^{৩৩} ঐ একই প্রবন্ধে তিনি আবার বলিয়েছেন— “ভালো নাটক মাঝেই একাধারে মঞ্চসচেতন এবং সাহিত্য।”^{৩৪} আবার ওই কথাই ঘুরিয়ে বলেছেন— “নাটক যখন সাহিত্য পদবাচ্য হয় তখন তা মঞ্চোপযোগীও হয়।”^{৩৫} কাজেই দেখা যাচ্ছে উৎপল দত্ত রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নাটক লিখলেও তাঁর লক্ষ্য ছিল নাটককে ‘সাহিত্য পদবাচ্য’ করে তোলা এবং তাকে ‘মঞ্চোপযোগী’ করা। উৎপল দত্ত তাঁর নাটক রচনা এবং উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন লোকে না দেখলে নাটকের কোন সার্থকতা থাকে না। এল.টি.জির মিনার্ভা পর্বে তাঁর অনেক নাটক মঞ্চসফল হয়নি। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন— “আমরা ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।”^{৩৬} ‘রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ’ প্রবন্ধে তিনি পরিচালকের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— “রাজনৈতিক নাটক তৈরি করে তারপর আকাদেমি নামক ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে কয়েক কুড়ি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ভদ্রলোকের সামনে অভিনয় করতে থাকলে সেটা আর রাজনৈতিক নাটক থাকে না। সেটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয়।”^{৩৭} তিনি মনে করতেন দশ বিশ হাজার শ্রমরাস্ত্র মানুষের সামনে অভিনয় করতে না পারলে রাজনৈতিক নাটকের কোনো মানে থাকে না।^{৩৮} প্রসঙ্গত মনে করা যায় উৎপল দত্ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শান্তি সম্মেলনের পক্ষে লিটল থিয়েটার গ্রুপের অচলায়তন অভিনয়ের কথা স্মরণ করে লিখেছেন “৩৫০০০ দর্শকের সামনে বিনি পয়সার রবীন্দ্রনাথের অভিনয় স্মৃতিপটে আঁকা থাকবে চিরদিন।”^{৩৯} ১৯৬৫ সালের ৭ই মে মনুমেন্টের পাদদেশে ‘পাঁচ লক্ষ’ লোকের সমাবেশে কল্লোলের বিজয় উৎসব হয়েছিল।^{৪০} উৎপল দত্ত একাধারে ছিলেন নাট্যকার অভিনেতা এবং পরিচালক। রাজনৈতিক চেতনা ছিল তাঁর মর্মগত। আর দেশ বিদেশের ইতিহাস সাহিত্য নাটক এবং মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল যে কোনো বিশেষজ্ঞের মত। তিনি নাট্যকার হিসেবে নাটকে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করতে চান, সেই নাটককে সাহিত্য মর্যাদায় উন্নীত করতে চান এবং তার উপস্থাপনায় এমন মঞ্চমায়া সৃষ্টি করেন যাতে তাঁর নাটকে দর্শক আবিষ্ট হয়। এই কাজগুলি তাঁকে একই সঙ্গে করতে হয়েছে। রাজনৈতিক নাটক লিখতে গেলে যে দুটি জিনিসের দরকার হয় তা হল বিপ্লবে আস্থা ও শোষিত শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত। উৎপল দত্ত নিজেও বলেছেন— “রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণীসত্য”^{৪১} এই কাজ করতে গিয়ে অনেকেই শ্লোগান সর্বস্ব নাটক, অবিশ্বাস্য অবাস্তব বা অকিঞ্চিৎকর নাটক লিখেছেন। সে নাটক কোন দর্শকের উপর কাজ করেনি। অন্য পক্ষে উৎপল দত্তের নাটকের সেই ক্ষমতা ছিল যা বক্তব্যের রাজনীতিকে উপস্থাপনার অভিনবত্বে দর্শকের মনে সঞ্চার করে দিতে পেরেছিল।

মিনার্ভা পর্বে লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা উৎপল দত্তের ‘অঙ্গার’ নাটক। ‘অঙ্গার’ নাটকের প্রথম উপস্থাপনার দিনটিকে (৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৯) শোভাসেন ‘স্মরণীয় দিন’ বলেছেন। এই নাটক করে লিটল থিয়েটার ঋণ মুক্ত হয়েছিল। আবার এ নাটকের ১১৫০-এরও বেশি অভিনয় হয়েছিল এবং কোনোদিন কোনো আসন খালি ছিল না। উৎপল দত্ত নিজে একটি লেখায় বলেছিলেন রাজনৈতিক নাটকের সাফল্যের একটা মাপকাঠি হচ্ছে তার উপর প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ। অঙ্গারকে বড় লোকদের পত্রপত্রিকা হিংস্র আক্রমণ করে। আর প্রত্যক্ষভাবে বিরোধীদের আক্রমণে ‘অঙ্গার’ বন্ধ হয়ে যায়।^{৪২}

‘অঙ্গার’ ৬টি দৃশ্যে বিন্যস্ত নাটক। এর বিষয় খনি দুর্ঘটনা ও খনি শ্রমিকের জীবনের

নিরাপত্তাহীনতা। এক কথায় মালিকপক্ষের শোষণে শ্রমিক জীবনের চিরন্তন দুর্দশা। ‘অঙ্গার’ নাটকের রচনা হয়েছিল ‘বড়াধেমো’ কয়লা খনি দুর্ঘটনার বিষয় নিয়ে। কোনো সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা নয় বরং সচেতন পরিকল্পনায় এ নাটক গঠিত। ‘বড়াধেমো’ কয়লাখনিতে উৎপল দত্ত ও আরও কয়েকজন চলে যান। ওঁরা দুর্ঘটনা স্থলে গিয়ে সরেজমিন সব কিছু দেখে শুনে নানারকম শব্দ তরঙ্গের টেপ করে নিয়ে আসেন। তারপর উৎপল দত্ত নাটক লেখেন। একে শোভাসেন বলেছেন— ‘তপস্য’। দিন পনেরোর মধ্যে নাটক লেখা হয়।^{১০} ‘অঙ্গার’ নাটকের শুরু একটি চমক দিয়ে। এতে দৃশ্যের মঞ্চ সজ্জার বিবরণের মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই। কিন্তু হঠাৎ ‘চোর’ ‘চোর’ হট্টগোল আর ওয়ার্ডারদের কয়লা চোরকে ধরে মার দেওয়ার ঘটনা দিয়ে শুরু করার মধ্যে একটা চমক আছে যা দর্শকদের আগ্রহ তৈরি করে। কিন্তু এরপর আসে খনিশ্রমিকদের জীবনের গতানুগতিক কাহিনী। প্রথম দৃশ্যে উত্তেজনা তৈরি করে রাখে সটফায়ারার দীনু ভট্টাচার্যের অতিরঞ্জিত মেলোড্রামাটিক সংলাপের উচ্চাবচতা। এছাড়া কাহিনীর মধ্যে কোনো চড়া দাগের কিছু নেই। বিনু, রূপা, বিনুর মা—তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ এই নিয়েই এ দৃশ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু এই দৃশ্যেই নাট্যকার এই স্বপ্ন সাধ প্রেম আশার কাহিনীর বিপরীত বিন্দুতে নিয়ে আসেন সনাতন চরিত্রটিকে— যে সাতদিন রাধানগর কোলিয়ারির বন্ধ খাদে আটকে ছিল। সনাতন শুধু আটকেই থাকেনি, তার বৈদ্যনাথ নামে যে পরিচয় ছিল তাও এই কোলিয়ারির দুর্ঘটনার সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। এই দৃশ্যের শেষেই এল কোলিয়ারিতে চাপা বিস্ফোরণের শব্দ। নাটকের exposition অংশে নাট্যকার দুই বিপরীত অবস্থার ছবি দিয়ে শুরু করলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যটিতে এল খনি দুর্ঘটনার তদন্তের চিত্র। হাইকোর্টের বিচারপতি, কোলিয়ারির উকিল, ম্যানেজার, ডাইরেক্টর -এরা যে স্বার্থের দিক থেকে একই গোত্রের—বিচারপতিরাও যে নিরপেক্ষ তদন্ত চান না বরং সচেতন ভাবে মালিক পক্ষের সহায়তা করেন তা দেখান হল। এই ভাবে শ্রেণী সচেতনতা ও শ্রেণী বিভাজন দেখানো হল। তৃতীয় দৃশ্যে খনি শ্রমিকের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার ছবি। অভাব, কাবুলিওয়ালার কাছে ধার ও শোধ করতে না পারা, শ্রমিকদের কাছে মুনসীর ঘুষ খাওয়া, কোনো এক নারীর জন্য একাধিক শ্রমিকের আকর্ষণ ও পরস্পরের ঝগড়া বিবাদ। এরই মধ্যে খনিতে আবার গ্যাস বেড়ে যাওয়া এবং শ্রমিকদের কাজ না করা; অভাবের তীব্রতা। এই দৃশ্যে শ্রমিক জীবনের বাস্তব অবস্থা এবং শ্রমিকদের জীবনের বৈচিত্র্য উঠে এসেছে। আবার সুবাদার মহাবীর সিং এসে জোর করে শ্রমিকদের কাজে নামাতে চায় তাদের মারে, আর এই মারের মুখে শ্রমিকদের একতা তৈরি হয়। চার নং দৃশ্যে মালিক পক্ষ থেকে শ্রমিকদের কাছে খনিতে নামার প্রস্তাব আসে—পাঁচশো টাকা বোনাস এবং স্ট্রাইক -এর দিনগুলোর পুরো পাওনা দেওয়া হবে। শ্রমিকেরা

এই টাকার প্রস্তাব ফেলে দিতে পারে না। তারই মধ্যে খবর আসে ইউনিয়নের আরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিনু তখন বেঁকে দাঁড়ায়; শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন ঘটে। অভাবের তাড়নায় বিনুর মায়ের রাগ হয়, বিনুকে অভিমান ভরে তিরস্কার করে—আর তাতেই অভিমানহত বিনু খনিতে নামতে যায়। পাঁচ নং দৃশ্যে খনিতে বিস্ফোরণ ও খনিতে বন্দী শ্রমিকদের নিকটজনদের উদ্বেগ। খনিমালিকের খনি বাঁচানোর জন্য পিট বন্ধ করে দেওয়া। সিকিউরিটি টিমের ক্যাপটেন বলেন খনিতে মানুষ আছে কিন্তু ম্যানেজার মানুষের চেয়ে কয়লা বাঁচাতে ব্যস্ত। সে বলে 'get rid of him.'^{৪৪} খনি মুখ বন্ধ করে দেবার সময় মা জিগ্যেস করেন 'কি হয়েছে রে?' সেপাই উত্তর দেয় 'কেন আর জিজ্ঞাসা করেন মা'? এই দৃশ্যে একদিকে শ্রমিকদের পরিজনদের উদ্বেগ, বেদনা, অসহায়তা, আর অন্যদিকে মালিকপক্ষের প্রতারণা করে খনি বন্ধ করে দেওয়া—এই বৈপরীত্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কেবলই কানে বাজতে থাকে বিনুর মায়ের বুকফাটা হাহাকর "বিনু যে না খেয়ে চলে গেল রে। ও যে বাড়া ভাত ফেলে রেখে চলে গেল।"^{৪৫} ছয় নং দৃশ্যে গভীর অন্ধকারে ঢাকা খাদের ভিতরে প্রাণপণে রাস্তা খুঁজছে সাতটি প্রাণী। জল ভরে দেওয়া হয়েছে খনিতে। তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা আর সমবেত ভাবে বাঁচবার চেষ্টা। শ্রমিকরা সুবাদার মহাবীর সিংকে মারে। মহাবীর ১৫ বছর কোম্পানীর কথা মত শ্রমিকদের উপর নানা টর্চার করেছে। এখন সে বলে—“আমাদের হাড় এখানে আস্তে আস্তে কয়লার সঙ্গে মিশে গেছে। সে কয়লা তুলে ইঞ্জিনে পুরেছে। সেই ইঞ্জিন রেল লাইন ধরে শিস দিয়ে চলে যাচ্ছে আমার গাঁয়ের পাশ দিয়ে—কৌশল্যার মা রান্না করতে করতে চোখ তুলে দেখছে—বুঝতে পারছে না।”^{৪৬} এই ট্রাজিক সিচুয়েশানের মধ্যেও নাট্যকার আর একটি চমক তৈরি করেছেন। মহাবীর একদিন আরিফকে ঘুষি মেরেছিল, বিনুকে ডাঙা মেরে মাথা ভেঙে দিতে চেয়েছিল। সেই অত্যাচারী সুবাদারের জন্য কারণ্য যেমন দেখালেন নাট্যকার তেমনি দেখালেন আর একটা চমক। কোম্পানীর সঙ্গে শেষ যে চুক্তি করে আসে শ্রমিকেরা সেই চুক্তিপত্র সকলে বাড়ির কাউকে দিয়ে এলেও মহাবীর নিজের পকেটে করে খনির ভিতরে নিয়ে চলে এসেছে। নিজের মেয়ের ছবি সবাইকে দেখাতে গিয়ে সে কাগজটা সে হঠাৎ আবিষ্কার করে

মহাবীর।। কাগজ সেই কাগজ। আমার জীবনের দান। এটা যে সঙ্গে নিয়ে এসেছি যদি মরি।
এটা কি করে পৌঁছবে উপরে? ... আমি কি করি?

আরিফ।। কোম্পানির উপর এত আস্থা, কাগজ নিয়ে এসেছ সঙ্গে?

মহাবীর।। (উদ্ভ্রান্ত) আমায় বলল যে, আমায় যে সাহেব কথা দিল।^{৪৭}

নাট্যকার এই শেষ দৃশ্যেও শ্রমিক মালিক শ্রেণীবিভাজন ভোলে নি। জলের তোড় ক্রমে বেড়ে

যায়। খনির ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের মৃত্যু আসন্ন। তাদের শেষ ইচ্ছা নাট্যকার তাদের চিঠির ভাষায় তুলে ধরেন। মোস্তাকের কণ্ঠে ফুটে ওঠে আব্বাজানের মালিক তোষণের সমালোচনা। “আব্বাজান, আমার সেলাম জানিবা। মোষ আরো তিনখানা খরিদ করিয়া যথাবিহিত দুধ সকল সাহেবকে ফজির কালেই দিয়া আসিবা এবং দত্ত সাহেবকে বিকালেও আধসের দিবা।”^{৪৮}

বিনুর চিঠিতে ফুটে ওঠে ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার বেদনা। প্রথম দৃশ্যে যে আশা নিয়ে বিনু কাজ শুরু করেছিল শুশুনিয়া পাহাড়ের তলায় একতলা বাড়ি আর বাগান করবার যে আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তা মিটলনা। বিনু লেখে—“শ্রীচরণেষু, মা, কি লিখি। কি করে তোমাকে বোঝাই—এবার আর জমি কেনা হোলো না।”^{৪৯}

সনাতনের কণ্ঠ বলে—“পৃথিবীর মানুষ তোমরা আমাদের ভুলো না। মানুষের ঐশ্বর্য আহরণ করতে আমরা নেমে যাই ধরিত্রীর অতল গর্ভে। সেখানে আমাদের জীবন রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।”^{৫০}

বিনু চীৎকার করে বলে—মা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম

সনাতন মোস্তাক রমজান গান ধরে—এ আল্লা দয়া নি করিবা আল্লারে।

বিনু চীৎকার করে আবার বলে— আর কিছু চাইনি আমি শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম।^{৫১}

‘অঙ্গার’ নাটকের পরিণতি পরবর্তীকালে উৎপল দত্তের নিজেরই যথেষ্ট বৈপ্লবিক বলে মনে হয়নি। কিন্তু শ্রেণীবিভাজনের এবং শোষক শোষিতের সম্পর্ক এই নাটকের কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের আড়ালে যথেষ্ট নিপুণ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে যে মানুষের কথা আমরা চাই—মানুষের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার কথা—তাও যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয়ত কোনো ব্যক্তি মানুষকে নাট্যকার এখানে ইচ্ছে করেই প্রধান করে তোলেননি—যদিও বিনু কিছুটা সেরকম ভূমিকা পেয়েছে। যেহেতু নাট্যকার সচেতন ভাবেই একে শ্রেণী শোষণের নাটক করে গড়েছেন কাজেই ব্যক্তি প্রাধান্য দেখাননি। বরং শ্রমিকদের এবং মালিকদের শ্রেণীগত নির্মাণই করেছেন। তবু এ নাটকের ১১৫০টি মহৎ উপস্থাপনা হয়েছে এবং উৎপল দত্তের মঞ্চ নির্দেশনা, তাপস সেনের আলোক সম্পাত, রবিশংকরের সঙ্গীত নির্মাণ, নির্মলেন্দু চৌধুরীর দলের গান এ নাটককে বিংশ শতাব্দীর একটি বিস্ময়কর উপস্থাপনা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই নাটকের উপস্থাপনায় যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রয়োগ নিয়ে সেকালে সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু মানুষের চোখের জলে এ নাটকের অভিষেক হয়েছিল। শোভাসেন লিখেছেন—

“আমরা প্রথম থেকেই টের পাচ্ছিলাম দর্শকদের ভালো লাগার স্পর্শ। প্রতি শো -

এর পর ন’জন শ্রমিকের জন্য চোখে জল নিয়ে অভিভূত দর্শকেরা স্তব্ধ হয়ে সীট-

এ বসে থাকতেন কিছুক্ষণ। এক এক দিন কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে গেছে। শেষ
দৃশ্য এতই হৃদয় বিদায়ক, তার সঙ্গে রবিশঙ্করের সঙ্গীত এমনই শ্বাসরোধকারী যে
দর্শক নাটকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যেতেন।”^{৬২}

‘ফেরারী ফৌজ’কে মন্থথ রায় বলেছেন ‘মহানাটক’। কিন্তু প্রবীণ বিপ্লবীরা এর গঠনশৈলীর
সমালোচনা করেছিলেন। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ বলেছিলেন—“রোমান্টিসাইজ করেছেন,
ক্রিটসাইজ করেননি কেন।”^{৬৩} গঠন পদ্ধতির দিক থেকে ‘ফেরারী ফৌজে’র অভিনবত্ব নেই।
কিন্তু মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ছিল। “মঞ্চকে বহুস্তরে সাজিয়ে আমরা যবনিকার ব্যবহার কার্যত
বর্জন করেছিলাম।”^{৬৪} নাটকের গঠনশৈলীর দিক থেকে এটি ৯টি দৃশ্যে বিভক্ত। একটিমাত্র গানই
নাটকের প্রথমে যুক্ত হয়েছে—সেটি নজরুলের লেখা ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’। নাটকের কাল পর্ব
১৯৩০-৩১; মুকুন্দদাসের ‘সমাজ’ পালার অভিনয় হচ্ছে। এই প্রথম দৃশ্যেই কতকগুলো ঘটনা
ঘটে যায়। যাত্রাপালা পুলিশ বন্ধ করে দেয়, রাতে বড়দিনের উপাসনায় সাহেবরা গির্জায় আসে,
সাধারণ মানুষ সূর্যসেন শান্তি রায়ের কথা আলোচনা করে; জমিদার-পুরোহিত-পুলিশ জনতাকে
ধর্মের শিক্ষা নিতে বলে, দুই প্রতিবেশীর বিবাদ মীমাংসাও হয় আর এর মধ্যেই চরম ঘটনাটি
ঘটে— যোগেন পণ্ডিতের ছেলে অশোক উইলমট সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে—পুলিশ এক
অজ্ঞান বালকের মুখে ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি শুনে তার বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা
করে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিপ্লবীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পাশাপাশি হত্যার রাজনীতি নিয়েও প্রশ্ন
ওঠে। এবং উৎপল তাঁর নিজের দর্শন স্পষ্ট করে দেন অশোকের মুখে। ব্যক্তি হত্যার দ্বারা দেশ
স্বাধীন হবে না। অতিবিপ্লবী চরিত্র কুমুদের সঙ্গে অশোকের তর্ক ওঠে। অশোক বলে “কোনো
লোক একা পারেন না। জনতা নিজেই পারে সে কাজ করতে। নিজের সংগঠন সৃষ্টি করতে।
লেনিন বলেছেন—”^{৬৫} কুমুদ বিদেশী পদ্ধতি নেবে না। তার সহজ সমাধান অশোক উইলমট
হত্যা হজম করতে পারেনি। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা ওঠে। কুমুদ হিতেন
দাশগুপ্তের মেয়ে দেবযানীকে ভালোবাসে। তৃতীয় দৃশ্যে অশোক বাড়ি যায় গোপনে এবং পুলিশের
হাতে ধরা পড়ে। তার মধ্যে আসে তাদের পারিবারিক জীবনের চিত্র। চতুর্থ দৃশ্যে পুলিশের
অত্যাচারের ছবি। পঞ্চম দৃশ্যে রাখার ঘরে বিপ্লবীদের খোঁজে গিয়ে বিষ মদে হিতেন দাশগুপ্ত মারা
যায়। ছয় নং দৃশ্যে পুলিশ অশোককে লোকের কাছে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়ে দেখায়। তার বাবা-মা-
স্ত্রী পর্যন্ত তাকে বিশ্বাস করে না। তাকে বিপ্লবীরা ভুল বোঝে, মৃত্যুদণ্ড দেয়। এদিকে জনসনকে
হত্যা করবার জন্য ছক কষে তারা ফাদার ফ্ল্যানগানকে হত্যা করে। অষ্টম দৃশ্যেও তাদের পরিকল্পনা
ব্যর্থ হয়। অশোককে সন্দেহ করে বিপ্লবীরা ভুল করে। প্রকৃত বিদ্রোয়ার হল কুমুদ। কিন্তু শান্তিদা

অশোককে হত্যা করে। মরবার আগে অশোক বলে যায় “আমাকে ওরা বিশ্বাসঘাতক সাজিয়েছে” এবং “আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় নি।”^{৬৬} কুমুদের প্রতারণায় শান্তিদা সহ গোটা দলটা মারা যায়।

এ নাটকে দুটো অপরাধের স্বীকারোক্তি এসেছে ডেলিরিয়ামের মধ্য দিয়ে—অশোকের, দেবব্রতের। পুলিশ তাদের ধরেছে। গোপনে শান্তিদার নীলমণি হিসেবে পুলিশের ইনফরমার হয়ে কাজ করাটা কৌশল হিসেবে ভালো কিন্তু তাতে বিপ্লবীদের কাজের বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। অশোকের পারিবারিক সম্পর্ক এবং পরিবারের কাছে তাকে বিচ্ছিন্ন করাটা পুলিশের ভালো চাল। যোগেনবাবুর বইলেখার কথা পরিবারের সবার সঙ্গে সবার সম্পর্কের দিকটা দেখানোতে সে সময়কার বিপ্লবী পরিবারের মানুষের মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এ নাটকে দৃশ্য যোজনা পরম্পরার দ্বারা বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ, পুলিশের কৌশল, হিতেন দাশগুপ্তের মদ্যপানের ঘোরে আত্ম সমীক্ষা, সাব ইনসপেক্টর প্রকাশের সংবেদনহীন দাস-মনোবৃত্তি সবই ভালো ভাবে দেখানো হয়েছে। হিতেন দাশগুপ্ত আর প্রকাশ মুখুটির যোগ “ইতিহাসের এক সংকট মুহূর্তে দুই দুর্ধর্ষ শিক্ষিত দার্শনিক গুপ্তার অস্থায়ী সন্ধি।”^{৬৭} নাট্য চমক সৃষ্টির অনেকগুলি সিচুয়েশন এ নাটকে আছে। প্রথমেই পুলিশের যাত্রা বন্ধ করা, তারপর অশোকের বোমা মারা, অশোকের বাড়িতে তার ছোট মেয়ে গোপাকে ভুলিয়ে অশোকের সন্ধান নেওয়া এবং শেষ মুহূর্তে অশোকের সততা ও কুমুদের বিশ্বাসঘাতকতা নাট্য ঘটনাকে বারে বারে একটা ধাক্কা দিয়ে গেছে। তবে এর কাহিনী দীর্ঘ কালের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত। কালিক ব্যাপ্তিতে এর ক্রিয়া ছড়িয়ে আছে। বিপ্লবীদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ের মুখে পূর্ববঙ্গের ভাষা বেশ সরসতা তৈরি করেছে। আবার শান্তিদার নীলমণিরূপে ভুল ইংরেজি বলাও বেশ সরস। এ নাটকের নাট্যদ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে শেষ দৃশ্যে। তার আগে এই দ্বন্দ্ব তেমনভাবে দেখান হয়নি। পুলিশী অত্যাচার দর্শকদের মনে পুলিশ সম্বন্ধে ঘণাবোধ তৈরি করে। ‘অঙ্গার’ নাটকে নাট্যকার খনি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিলেন তাদের দুর্দশা দেখিয়ে, ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকে সহানুভূতির চেয়ে বিপ্লবীদের প্রতি একটা বিশ্বাস ও নির্ভরতা তৈরি করে। জনসাধারণের মুখে তাই শেষ সংলাপ-শান্তি রায়ের মৃত্যু নাই। বিপ্লবী নাটকের পরিণতি মানুষের মনে একটা রুদ্ররস সৃষ্টি করে তাকেও বিপ্লবের পথগামী করবে। সে অনুভূতি এখানে সৃষ্টি হয়নি কিন্তু পুলিশ ও বিশ্বাস ঘাতক এবং বিপ্লবীদের সম্বন্ধে একটা উপলব্ধি তৈরি হয়েছে।

‘কল্লোল’ এল.টি.জির মিনার্ভা পর্বের উল্লেখযোগ্য নাটক। ১৯৬৫ সালের ২৯ মার্চ প্রথম অভিনয় মিনার্ভায় ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ নাটকের নাট্যরূপ খুব জমেনি। তবে তার মঞ্চসজ্জায় নানা অভিনবত্ব ছিল। ‘কল্লোল’ নৌবিদ্রোহ নিয়ে লেখা। এর খসড়া লেখা হয়েছিল ১৯৫৬ সালে

তথ্যমূলক দলিল হিসেবে। ‘কল্লোল’ নাটক লিখতে গিয়ে তিনি বিদ্রোহী নাবিকদের লেখা প্যামফ্লেট-প্রবন্ধ জোগাড় করেছিলেন এবং বোম্বাই এর ওয়াটারফ্রন্ট বস্তু থেকে সংগৃহীত কারো কারো অভিজ্ঞতার কাহিনীরও আশ্রয় নিয়েছিলেন।^{৬৮} ‘কল্লোল’ সরাসরি বিদ্রোহের নাটক। এ নাটকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের বীরত্বের কথা এবং কংগ্রেসের ‘নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার’^{৬৯} কথা বলেছিলেন, ‘নাটক মারফত ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগ ও আপসহীন লড়াই-এর কথা’^{৭০} তুলে ধরেছিলেন। ‘কল্লোল’ বহু রজনী অভিনয়ের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। ‘কল্লোল’ নাটক মোট ১২টি দৃশ্যে বিভক্ত। উৎপল দত্ত তাঁর কোনো নাটকেই দৃশ্য শব্দবন্ধ ব্যবহার করেননি। কেবল সংখ্যা দ্বারা উপবিভাগগুলি চিহ্নিত করেছেন। কল্লোলে এরকম ১২টি বিভাগ আছে। নাট্যকার সূত্রধারের কথা দিয়ে নাটক আরম্ভ করেছেন, নাটকের দৃশ্যগুলির সংযোজন করেছেন এবং নাটকের শেষও হয়েছে তাঁর কথা দিয়ে। এ নাটকের মধ্যে সময়ের ঐক্য নেই। প্রথম দৃশ্যে খাইবার যুদ্ধ জাহাজের নৌ-সেনাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। তার দু’বছর পরে দ্বিতীয় দৃশ্যের কথা এসেছে। স্থানের দিক থেকেও এর ঐক্য নেই। খাইবার জাহাজ, ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তু, ভাইস-এডমিরাল র্যাটট্রের বাংলো, মুলন্দ বন্দী-শিবির—এতগুলো জায়গার কথা এসেছে। তবে খাইবার জাহাজকে এবং তার গানার সাদুল সিংকে এর কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে হয়। সে দিক থেকে খাইবার জাহাজের পরিচয়, তার গানার এবং রেটিংদের বীরত্ব, তার হারিয়ে যাওয়া, ফিরে আসা এবং সাদুলের পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনী গল্প বোঝার জন্য কাজে লাগে। দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে সূত্রধারের কথায় প্রথম বিদ্রোহের খবর পাওয়া যায়। তান্তিকেরা বলেন "with the opening of ... conflict the real plot begins."^{৭১} দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে পাই নৌবিদ্রোহের খবর, তৃতীয় দৃশ্যে শুরু হয় বিদ্রোহ। এখান থেকেই নাটকের action শুরু। এরপর দৃশ্য পরম্পরায় এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি, রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরেজ বাহিনীর বিদ্রোহ দমন, বিদ্রোহের নেতা সাদুল সিংকে হত্যা—এই ভাবেই নাটক পরিণতিতে পৌঁছেছে।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে খারাপ খাবার দেওয়াকে কেন্দ্র করে এবং রাজদ্রোহী পত্রিকা ‘পীপলস এজ’ জাহাজে আসার তদন্ত নিয়ে ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে বিরোধ বাধে। নৌবাহিনীতে এরকম বিরোধ আগেও হয়েছে। কিন্তু এবারের লড়াই দেশের পরিস্থিতির চাপে অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। এ নাটকের নবম দৃশ্যে সাদুল বলেছে—“সারা ভারতে লড়াই শুরু হয়ে গেছে জানেন না? বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিমানবাহিনী ধর্মঘট করেছে। বিহারে পুলিশ ধর্মঘট শুরু হয়েছে। কলকাতা সাত দিন ধরে একরকম স্বাধীন হয়ে আছে। বোম্বাই এখনো লড়াইয়ে। দেখছেন না ধোঁয়া। মারাঠা

রেজিমেন্টকে বৃটিশ ফৌজ দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়েছে।”^{১৩} এই পরিস্থিতিতেই খাইবার এর বিদ্রোহ। আর এর পরের দৃশ্যেই ধর্মঘটী নেতা সাকসেনা এসে জানান তারা কয়েকটা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। এই দাবিগুলির কোনটি বিদ্রোহমূলক নয়। তাই সাদুল বলে—“আমাদের ধারণা ছিল এটা স্বাধীনতার লড়াই। আমাদের ধারণা ছিল দাবি হবে একটাই—ভারত ছাড়া—বিনা শর্তে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।”^{১৪} সাকসেনা আপোষের পক্ষে, বোম্বাই-এ সাধারণ ধর্মঘট ডাকাটাকেও সে ভুল মনে করে। তৃতীয় দৃশ্যের উদ্ভেজক পরিস্থিতির বিপরীত অবস্থা তৈরী হল এই চতুর্থ দৃশ্যে; কিন্তু তাতে খাইবার জাহাজের নৌসেনাদের বিদ্রোহের ইচ্ছা দমে গেল না। বরং গোরা ফৌজ কাসল ব্যারাকস আক্রমণ করেছে দেখে খাইবার গোরাদের উপর গোলা বর্ষণ করে। এই কাজকে আবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিন্দা করা হয়। চতুর্থ দৃশ্যের বিদ্রোহের সমান্তরাল পরিস্থিতি তৈরি হয় পঞ্চম দৃশ্যে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তিতে। লুকানো অস্ত্র বের করে ফিরিঙ্গি সৈন্যদের আক্রমণ করা হয়। ছয় নং দৃশ্যে খাইবার জাহাজকে বৃটিশরা ঘিরে ধরেছে। ওদিকে ধর্মঘটী নেতাদের সাহায্য বা সমর্থনও মিলছে না। সাকসেনা আপোষ আলোচনায় গেছেন। নৌসেনারা না খেয়ে মরছে। সপ্তম দৃশ্যে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার ছবি মগনলাল চরিত্রের ভূমিকায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভাইস এডমিরাল র্যাটট্রে এই বিদ্রোহের পিছনে কমিউনিস্টদের হাত এবং তার পিছনে রাশিয়ার মদত দেখছেন। সপ্তম দৃশ্যেই রাজনীতির নির্লজ্জ খেলাটা নাট্যকার স্পষ্ট করেছেন। মগনলালের বুদ্ধিতে র্যাটট্রে ধর্মঘটী নেতা সাকসেনার সঙ্গে কথা বলেন। সাকসেনা কিছু না বুঝে এবং মগনলাল সব জেনে বুঝে র্যাটট্রের দেওয়া প্রতিশ্রুতি খাইবার জাহাজের সাদুল সিংদের জানায়। র্যাটট্রের সঙ্গে আলোচনা করতে এসে সাদুল সিং এবং অন্যান্যরা প্রতারিত ও বন্দী হয়। মুলন্দ বন্দী শিবিরে পুলিশের অত্যাচারে সাদুল মারা যায়।

এ নাটকের ক্রিয়া তৃতীয় দৃশ্যেই যথার্থ শুরু হয়; চতুর্থ দৃশ্য থেকেই সে ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া চলতে থাকে। পঞ্চম দৃশ্যে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তিতে তৃতীয় দৃশ্যের লড়াই এর বিস্তার। ছ’নং দৃশ্য নাট্য ক্রিয়ার বিস্তারের চেয়ে নাট্যচরিত্রের পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয়। নৌবিদ্রোহ এ নাটকের মূল ক্রিয়া আর বিদ্রোহকে ধ্বংস করা এ নাটকের বিপরীত ক্রিয়া—কিন্তু ঐ ক্রিয়ারই বিস্তার। আট সংখ্যক দৃশ্যে নৌবিদ্রোহের প্রকৃত পরিস্থিতি না বলে মূল ভূখণ্ডেও যে বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ এবং সমান্তরাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা বলা হল। নয় সংখ্যক দৃশ্যে খাইবার জাহাজের সৈন্যরা যখন লড়াই করবার জন্য তৈরি হচ্ছে তখনই তার বিপরীত ভূমিকায় আপোসের কথা বলতে এসেছে মগনলাল ও সাকসেনা। দশ নম্বর দৃশ্যে খাইবার আত্মসমর্পণ করে। এ নাটকের ক্রিয়া ঠিক পঞ্চমসন্ধির ত্রিভূজের ছক মেনে তৈরি হয়নি। নাট্যকার কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার

এবং কমিউনিস্টদের লড়াই এর ইতিহাস বলতে চেয়েছিলেন। তা তিনি করেছেন। বিদ্রোহ যে নাটকের ভাববীজ, বিপ্লবের কথা যে নাটকে তুলে ধরার কাজ হয় তার গড়ন নাট্যশৈলীর তত্ত্ব মেনে হতেও পারে; কিন্তু এক্ষেত্রে হয়নি। বরং সূত্রধারের মুখে দৃশ্য সংযোজন করে তাকে দিয়েই বিদ্রোহের ইতিহাস নাট্যকার বলেছেন অগ্নিবর্ষী অথচ সংবেদন সৃষ্টিকারী শব্দবন্ধে। সূত্রধার এর কখনরীতির ব্যবহার সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশে ছিল। দৃশ্য পরম্পরার যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা ছিল না। অথচ এ নাটকে সূত্রধারের ভূমিকা কাহিনীর সংযোজকের মাত্র নয়, তারই কথায় আভাস পাই বহু সহস্রের ক্ষুদ্র ক্রোধ কীভাবে বিদ্রোহে রূপায়িত হয়। সেই জানায় নিশীথের গভীরে যুদ্ধের গাড়ি বস্তিতে ঢেকার ঘটনা। শেষ দৃশ্যে তারই মুখে ধ্বনিত হয় আশাবাদ। “হে পশ্চিম প্রান্তের উদ্যত মশাল, আবার জ্বলে উঠবে কবে নূতন বিদ্রোহের দীপ্তিতে...।”^{৬৪} এ নাটকের মধ্যে ব্যবহৃত ঘন ঘন জ্ঞেগানে মুখরিত হল প্রেক্ষাগৃহ। নাটকে গান নেই কিন্তু মঞ্চ উপস্থাপনায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহারাষ্ট্রের ‘পোয়াডা’ ও ‘লাওনি’ সুরে গান যোগ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংগীত ও বিভিন্ন ‘অঙ্গার’ ‘ফেরারী ফৌজ’ থেকে ‘কল্লোল’—উৎপল দত্তের রাজনৈতিক বক্তব্য তীব্রতা পেয়েছে। কিন্তু সচেতন রাজনীতি প্রচারের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর লক্ষ্য ছিল নাটককে কিছুটা ‘মানবিক গুণ যুক্ত’ (human interest) করে তোলা। এজন্য ‘অঙ্গারে’ শ্রমিক জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র, প্রেম ভালোবাসা বঞ্চনা বিষাদের কথাও শ্রমিকদের জীবন কথার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। ‘ফেরারী ফৌজে’ এসেছিল অশোকের পারিবারিক জীবন ও কুমুদের প্রেম কথা। অশোককে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়ে পরে কুমুদকে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করানোর মধ্যে চমক সৃষ্টিও ছিল। ‘কল্লোলে’ এক নারীকে কেন্দ্র করে দুই পুরুষের বিবাদ ছিলো—তবে তা খুব একটা ক্রোধ বা প্রতিহিংসার রূপ পায়নি। পবিত্র সরকার লিখেছেন—এসব নাটকে একটা প্রেমের গল্প “মূল নাটকের সঙ্গে আলগা ভাবে লেগে থাকত, কিছুতেই মূল নাট্য-ঘটনার থেকে সহজভাবে উঠে আসত না”^{৬৫} একথা সত্য। কিন্তু তাঁর একটি বিখ্যাত নাটক ‘মানুষের অধিকারে’ এই প্রেম কাহিনী থেকে মুক্ত। “এই নাটকে নাট্যকার প্রথমে মূল ঘটনার দ্বারাই অভিভূত হয়েছিলেন ফলে ঘটনার মধ্যে পরিপূর্ণ নাটকীয়তা তিনি অত্যন্ত সমর্থভাবে নিষ্কাশন করেছেন। বাড়তি কাহিনী জুড়ে আলাদা ‘হিউম্যান ইন্টারেস্ট’ তাঁকে তৈরি করতে হয়নি।”^{৬৬}

নাটকের মূল বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এলাবামা রাজ্যে ১৯৩১ সালের স্কটসবরো মামলা থেকে নেওয়া। এর থিম মৌলবাদের শক্তি প্রদর্শন এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই। লড়াই-এর পরিণতি এ সব ক্ষেত্রে যা হয়—তাই নিরপরাধ নিগ্রো কিশোরদের মৃত্যুদণ্ড। নাটকের সূত্রপাত ১৯৬৭ সালের আগস্ট, স্থান ডেট্রয়েট শহর। ১৯৬৭ র ঘটনা এ নাটকের মুখবন্ধ। শ্বেতাঙ্গ, ভিয়েতনামের

যুদ্ধ ফেরৎ অগাস্টাস ডেভিড গ্র্যানভিল রাজপথের উপর এনিটা হুইটনী নামের এক কৃষগ তরুণীকে ধর্ষণ করে ধরা পড়ে। অন্যান্য সেন্দিরা যখন গ্র্যানভিলকে ক্ষমা করে দিতে বলে তখন স্টিভ (সেও সেন্দি) তাদের একটা গল্প বলে।

“স্টিভ ॥ বোসো গল্প বলি। ... আজ কেন স্টিভ এত হিংস্র—আর মার্থা কেন মেয়ে হয়েও

নিষ্করণ—তা বুঝতে হলে পেছোতে হবে, ধরো—সেই ১৯৩১ সালে—স্কটস্‌বরো মামলা।... তারিখ ছিলো ২৫ শে মার্চ, ১৯৩১, স্থান পেন্টারক স্টেশন—এলাবামা রাজ্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।”^{৬৭}

এরপরই গল্প পিছিয়ে যায় ৩৬ বছর; এবার মূল কাহিনী আরম্ভ হয়। এলাবামা রাজ্যের পেন্টারক স্টেশনে ২৫ মার্চ, ১৯৩১ এ। নাটকে এভাবে গল্প বলার স্টাইল উৎপল দত্তের নাটকে নতুন। পরে মনোজমিত্র তাঁর একটি নাটকে ফকিরের মুখে গল্প বলার রীতি ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে প্রত্যেক অঙ্কে ফকির গল্প বলে গেছেন—তাঁর গল্পের কথাসূত্রেই নাটকের অভিনয় হয়েছে। এখানে পুরো গল্পটা একবারেই স্টিভের মুখে বলানো হয়েছে।

‘মানুষের অধিকারে’ নাটকের গঠন অন্যান্য নাটকের চেয়ে অনেক দৃঢ় সংবদ্ধ। তাঁর নাটকের কাহিনী অনেকগুলি উপবিভাগে বিন্যস্ত থাকে। ফলে অনেক সময় তা যথেষ্ট আঁটো সাঁটো হয় না। ‘মানুষের অধিকারে’ ভূমিকা ও পরিশিষ্ট ছাড়া আর মাত্র তিনটি অঙ্কে বিভক্ত। ডেট্রয়েট শহরে আগস্ট মাসের এক রাত্রে যে ধর্ষণের ঘটনাকে নিয়ে গল্প শুরু হয় তা নিগ্রোদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের কাহিনীর দৃষ্টান্ত চয়ন করে আনে। ২৫ মার্চ ১৯৩১ এ পেন্টারক স্টেশনে যবনিকা উঠলে দেখা যায় নিগ্রো ছেলেদের সঙ্গে কি একটা ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গদের মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উগ্র মৌলবাদী শ্বেতাঙ্গদের নিগ্রোবিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নিগ্রোদের হত্যা করবার এক উল্লাসে মেতে ওঠে সাদা চামড়ার লোকেরা। বিল নিগ্রো হত্যায় অভিজ্ঞ। ডেকাটুরে ভাগচাষীকে মারবার সময় সে ব্যাণ্ডপার্টি নিয়ে গিয়েছিল। সে অনভিজ্ঞ ড্রসবিকে বলে “ব্যাপারটা কিছু না। ফাঁস, একটু আগুন, একটা চীৎকার—ব্যাস। ঐ চীৎকারটায় একটু গায়ে কাঁটা দেয়।”^{৬৮} এই অঙ্কে নিগ্রো কিশোরদের হত্যা করবার উল্লাস চরিতার্থ হল না—ডেপুটি শেরিফ ছিল এই উন্মাদ খুনীদের হাত থেকে ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে যায় “দুটো ঘুষি মেরেছিস বলে তোদের ফাঁসিতে লটকাতে দেব না।”^{৬৯} এই দৃশ্যে নিগ্রো ছেলেদের হত্যা করবার জন্য জনতার বিক্ষোভ দুটি সাদা চামড়ার বেশ্যাকে দিয়ে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ, এবং উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচাতে শেরিফ ওয়ারেনের জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা—এই ভাবে অঙ্কটির মধ্যে কাহিনীর ওঠা নামা বেশ নাট্য কৌতূহল তৈরী করে। পরের অঙ্ক ২০ নভেম্বর ১৯৩৩- প্রথম

বিচারের দৃশ্য। বিচারের দৃশ্য যে কোন দৃশ্যমাধ্যম শিল্পে বেশ উত্তেজক হয়ে ওঠে। বিচারক আসার আগেই বহু দর্শকে গ্যালারি পূর্ণ হয়ে যায়। এই দৃশ্যে মেয়েরাও ধর্ষণের মামলা দেখতে এসেছে। পোলক নামে একজন দর্শক বলছে “ধর্ষণের মামলা দেখতে বেশ লাগে। এমন সব কথা বলে যে শরীর গরম হয়ে ওঠে।”^{১০} সরকারী উকিল এটর্নী জেনারেল টম নাইট, সহকারী এ.ই.বেইলি আদালতে ঢুকলে জনতা তাদের সম্বর্ধিত করে। রিপোর্টারেরা নাইটের সঙ্গে কথা বলেন। এই কথোপকথনে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের জাতিবিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে যায়। নাট্যকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই নাটক লেখেন তাও এই কথোপকথনে স্পষ্ট হয়। স্কটস্বরো মামলা নিয়ে মানবাধিকার রক্ষার দাবীতে মস্কোয়, বার্লিনে, পিকিঙে, লণ্ডনে, প্যারিসে মিছিল বেরিয়েছে। রোমাঁ রোলাঁ, সান ইয়াং সেন, আটনস্টাই, ড্রাইজার ম্যাকসিম গোর্কী বিবৃতি দিয়ে এ মামলা তুলে নিতে বলেছেন। কিন্তু মার্কিনী উগ্র জাতিবাদ তাতে কান দেয়নি। লিবোভিটস এই মামলায় আসামী পক্ষের উকিল। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার। এই বিচারের দৃশ্যটি উৎপল দত্তের একটি অনবদ্য রচনা। লিবোভিটস পদে পদে সরকারী আইনজীবী ও বিচারকের ভুল দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্যপ্রাণেদিত আচরণের সমালোচনা করেছেন। যুক্তি এবং আইনকে ক্ষুণ্ণ করে বিচারপতিও নিগ্রো হত্যায় প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে গেছেন। লিবোভিটসের সহকারী ব্রডস্কি এটর্নী জেনারেলের বক্তৃতার সার সংকলন করেছেন একটি কথায় “এটর্নী জেনারেলের দীর্ঘ নির্বাচনী বক্তৃতায় তথ্য নেই, আগে উগ্র বর্ণ বিদ্বেষ।”^{১১} সমস্ত মিথ্যা আর সাজানো ঘটনাকে লিবোভিটস খণ্ডন করেও বোঝেন এ বিচারে তিনি আসামীদের রক্ষা করতে পারবেন না। আদালতের সওয়াল সম্বন্ধে পবিত্র সরকার লিখেছেন—

“আদালতের সওয়াল জবাবের মধ্যে স্বভাবতই নাটকীয় সম্ভাবনা মারাত্মক রকমের বেশি, নাট্যকার তার এক ফাঁটা হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দেননি।... সরকারি উকিল নাইটের সওয়াল চলে সরল রেখায়—প্রত্যাশিত কয়েকটি প্রশ্ন, তার প্রত্যাশিত উত্তর, বিস্ময়হীন, চমকহীন, পূর্ব নির্দিষ্ট। কিন্তু আসামী পক্ষের অ্যাডভোকেট লিবোভিটসের সওয়াল ত্রিভুজের মতো ঢালু জায়গা থেকে ক্রমশ একটি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায়। তারপর একটি অভাবিত তথ্য দিয়ে তিনি সাক্ষীর মিথ্যে কথার বুলি হঠাৎ ফাঁসিয়ে ঘটনাকে আবার হঠাৎ তীব্রতা থেকে ঘৃণার সমতলে নামিয়ে আনেন। তাঁর কথা দিয়ে ওই চমকের শাস্ত ভিত্তি তৈরি করা দেখবার মতো, সঙ্কট নির্মাণ এবং গ্রন্থিমোচনও দেখবার মতো। ভিতরে এই ক্রম সৃজ্যমান নাটকের সঙ্গে বাইরে উন্নত জনতার ক্রমশ বিক্ষুব্ধতার নাটকের আভাস তিনি সার্থকভাবে মিশিয়েছেন।”^{১২}

নাটকে শেষ পর্যন্ত নিগ্রো যুবক হে-উড-প্যাটারসনের ফাঁসি হয়েছে। জনতা ফাঁসির আদেশ শুনে উল্লাসে মেতে উঠেছে। প্যাটারসন সরকারি উকিল নাইটকে কাছে ডেকে জিগেস করে ‘কবে তারিখ?’ নাইট (হেসে) উত্তর দেয় ফেব্রুয়ারী ৮ তারিখে। হে-উড-প্যাটারসন শান্ত স্বরে বলে—
 “ভুল করছেন। আগে মরবে আমার হত্যাকারীরা প্রত্যেকে, তারপর মরবো আমি। যেদিন আমার সাক্ষীদের হাতে রাইফেল দেখা দেবে, সেদিন যে আমি আবার বেঁচে উঠবো।”^{৭৩} এ পর্যন্ত ১৯৬৭ থেকে পিছিয়ে গিয়ে বলা ১৯৩১ এর গল্প। নাট্যকার অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে ১৯৬৭ র নিগ্রো আন্দোলনের ঘটনার সঙ্গে এ কাহিনীকে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রথম অঙ্কে যে ব্র্যান গ্র্যানভিলকে ক্ষমা করবার কথা বলেছিল সেই এবার বলে “মেরে যাও! দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে মেরে যাও! থামবে শুধু রাইফেল বেশী গরম হয়ে গেলে।”^{৭৪} উৎপল দত্ত এই রাইফেলের শক্তিকেই বিশ্বাস করতেন। স্টিভের মুখে তিনি তাঁর মতাদর্শই প্রকাশ করেছেন।

“স্টিভ। হে কৃষ্ণবর্ণ চারণ কবি নতুন গান গেয়ে শোনাও আমায়। সে গানে থাকে যেন মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎ—সে গানে থাকে যেন দর্পিত খুনীদের প্রতি যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ। গান গাও বলিষ্ঠ মানুষের বলিষ্ঠতর ইতিহাস নিয়ে যৌবনের সূর্য অভিযান আর সশস্ত্র নিগ্রো কৃষকদের ব্যারিকেড যেন হয় সে গানের ছন্দ আর লয়। সে-গানে চাইনা শুনতে স্বাস্থ্য শান্তির বাণী। দোহাই তোমার—চাইনা খ্রীষ্টান কবরের শান্তি! আমাকে শোনাও মুক্তিক্ষুধায় অধীর সেই সব কালো মানুষের গান—যারা চায় মুক্তির যুদ্ধ!”^{৭৫}

নাটকের সংলাপ এখানে নাট্যকারের আশাবাদ আর মানুষের মুক্তিযুদ্ধের যৌগ স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।

‘প্রোফেসর মামলক’ সম্বন্ধে উৎপল দত্ত লিখেছেন—“আমাদের ক্রোধের প্রকাশ প্রফেসর মামলক।”^{৭৬} এর প্রথম অভিনয় ১৯৬৫। এর আগে তাঁর নাটকগুলি পত্রপত্রিকায় এমনকি গণনাট্য সংঘের নেতাদের “তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে।”^{৭৭} জর্জরিত হয়েছে। ‘অঙ্গার’ ‘স্পেশাল ট্রেন’ পরে ‘কল্লোল’ সমালোচকের বাণে আক্রান্ত হয়েছে। ‘প্রোফেসর মামলক’ ফ্রিড্রিশ ভোলফের নাটকের অনুবাদ এ নাটকে সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জার্মান নাটকের আড়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। “শাসকশ্রেণী কীভাবে কুৎসিৎ জাতিবিদ্বেষকে ব্যবহার করে শ্রমিক শ্রেণীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে, তারপর চেপে ধরে বুদ্ধিজীবীর টুঁটি, তারই ভীষণ আলেখ্য ঐ নাটক।”^{৭৮} মাত্র চারটি অঙ্কে এ নাটক বিন্যস্ত। উৎপল দত্তের নাটক যেমন বহু বিষয়ের উপস্থাপনা করে ছড়িয়ে পড়ে, এ নাটকে তা হয়নি। ‘মানুষের অধিকারে’ নাটকের মত এ নাটকের গঠনও

দৃঢ়বদ্ধ। এ নাটকের কাহিনী অঙ্কে বিভক্ত। এর লক্ষ্য পরিষ্কার, গতি তীব্র। প্রথম অঙ্কে মামলকের হাসপাতালে কাহিনীর সূচনা। ড. ইঙ্গের মা ফ্রাউ রুয়ফ জার্মান মহিলা। ইহুদী ব্যবসায়ীদের বড় বড় দোকানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার ব্যবসা চলছে না। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। এখান থেকেই জার্মানদের মধ্যে ইহুদী বিদ্বেষের শুরু। ডা. হেলপাখ (জার্মান) ইঙ্গেকে বলছে ‘মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্যের আসল কারণ’ এই ইহুদীদের ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা কুক্ষিগত করা। এরপর সংবাদপত্র মালিক জাইডেলের সঙ্গে হেলপাখের কথায় দেখা যায় পররাজ্যগ্রাসী ভাবনা তখনকার সাধারণ জার্মানদেরও তাড়িত করছে। তার কথায় “যেখানে জার্মান ভাষা বলা হয়, যেখানেই জার্মান শিরায় জার্মান রক্ত বইছে, সেখানেই জার্মানি।”^{৭৯} ডা. ইঙ্গের কথাতেও এর প্রতিধ্বনি “আজ আমাদের জনগণের প্রয়োজন এক মত, এক পথ, অর্থাৎ এক নেতা।”^{৮০} এই অঙ্কেই conflict তীব্র হয় যখন আহত জার্মান শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আনা হয়। ইঙ্গে তাকে জিগ্যেস করে “তোমার গায়ে কি খাঁটি জার্মান রক্ত?”^{৮১} তখন শ্রমিক উত্তর দেয় “আমি হলাম গে মজদুর, যখন আমাকে আর আমার কমরেডদের ঘাড় ধরে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে, কই তখন ত কেউ এসে জিগ্যেস করে না আমার খাঁটি জার্মান রক্ত, না কি আমি ভারতীয় কুলি, না আফ্রিকার জুলু!”^{৮২} হেলপাখ বলে “যাদের গায়ে জার্মান রক্ত তারাই ভাই।”^{৮৩} ইঙ্গে জাতিতত্ত্ব ও দৈহিক শক্তির একীকরণ করে। মামলক তা মানেন না। তিনি বলেন দৈহিক শক্তির সঙ্গে জাতিতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই।^{৮৪} এই ভাবে প্রথম অঙ্কেই মূল দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় অঙ্কে এই conflict আরো তীব্র হয়। এবার আলোচনার জায়গাটা মামলকের বাড়ির বৈঠকখানা। প্রফেসর মামলকের স্ত্রী এলেন খাঁটি জার্মান। ছেলে রলফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র এবং কমিউনিস্ট পার্টির লোক। রুথ স্কুলের ছাত্রী। জার্মানীর আইনসভা ভবনে হিটলারের দলের লোকেরা আঙুন লাগিয়ে দিয়েছে। কাগজে সেটাকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ বলে প্রচার হচ্ছে। রলফ তা মানে না। রুথ কমিউনিস্টদের পছন্দ করে না। বেতারে হিটলারের গলা শুনে সে পুলকিত হয়। রলফকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শ থেকে ফেরানো যায় না। বাবাকে সে বলে তাদের লড়াইটা “শ্রেণীগত”^{৮৫} মামলকও মনে করে ‘রাইখস্টাগে’ কমিউনিস্টরাই আঙুন দিয়েছে। পক্ষ অবলম্বনের এই মধ্য পথে সংবাদপত্র সম্পাদক জাইডেল একগাদা কাগজ নিয়ে ঢোকে। পড়ে শোনায় জার্মান সরকার কমিউনিস্ট, ডাক্তার, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিকতাবাদী, ইহুদী প্রমুখ লোকদের গ্রেপ্তার করা শুরু করেছে। জাইডেল মামলককে অনুরোধ করে কিছুদিন দেশ ছেড়ে সরে যেতে। সে নিজে জার্মান, তারও রক্তে উদ্দীপনা। জার্মানীতে “দেশপ্রেমিক শক্তির এক বিশাল দানবীয় নাটক”^{৮৬} শুরু হয়েছে। ডা. ইঙ্গে মামলককে বলে সে আর ইহুদীর অধীনে কাজ করবে না।^{৮৭} তার রক্তে জার্মান জাতির রক্তের ডাক পৌঁছেছে।^{৮৮} রলফ

সত্যের জন্য সংগ্রামে অংশ নিতে চলে যায়। এই ভাবে একদিকে কমিউনিস্ট আর অন্যদিকে জার্মান জাতির রক্ত, অহংকার, গৌরববোধ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে পৌঁছায়। এটাকে নাটকের ক্রিয়ার উর্ধ্বগামীরূপ (rising action) বলা যায়। তৃতীয় অঙ্কে এই নাটকের ক্লাইম্যাক্স। সরকার সমস্ত সরকারী কাজকর্ম থেকে ইহুদীদের বিতাড়িত করবার আইন জারি করেছেন। মামলক অস্থির পদচারণা করছেন। তাঁর হাসপাতালে তাঁরই প্রবেশাধিকার নেই। এই অঙ্কে রুথ অপমানিত হয়ে স্কুল থেকে ফিরে আসে। তার পিঠে বৃহদাকার পাঁচকোণা তারা চিহ্ন আঁকা। তার বই-এ খাতায় সব জায়গায় লেখা 'ইহুদী'। জাইডেল এসে জানায় মামলক-এর হাসপাতাল অরাজকতার আখড়া হয়ে উঠেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পত্র ছাপাতে জাইডেল অস্বীকার করে। সমস্ত জাতির কাপুরুষতা মামলককে মর্মান্বিত করে। এই অঙ্কেই এর্নাট নামে এক শ্রমিক-কমিউনিস্টের কথায় হিটলার বাহিনীর অত্যাচারের ছবি ফুটে ওঠে। মামলককে নিয়েই এ নাটক; সেই ইহুদী শ্রেণীর একটি প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। এই অঙ্কেই তাকে ইহুদী বলে অপমান করে জামা কাপড় ছিঁড়ে চুল টেনে গলায় ইহুদী লেখা কার্ডবোর্ডের টুকরো বুলিয়ে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়। আর ডা. হেলপাখ বাটিকা বাহিনীর পোষাকে ঢুকে মামলকের হাসপাতালের দখল নেয়। সরকার সমস্ত অনার্য কর্মীদের বরখাস্ত করেছে -এ সংবাদও দেয়। এই অঙ্কেই এ নাটকের ক্লাইম্যাক্স। এই অঙ্কে রলফের প্রতি ডা. ইঙ্গের আচরণে যে হৃদয়বস্তুর পরিচয় লেখক ফুটিয়ে তোলেন তা একটা উপকাহিনীর কাজ করে। চতুর্থ অঙ্কে একটি মোচড় দিয়ে কাহিনীর মধ্যে কৌতূহল বজায় রাখা হয়েছে। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা সরকারি কাজ করতে পারবে। এতে অনেকে স্বস্তি পায়। হেলপাখ অন্য একটা পয়েন্ট তোলে। জাতীয় নবচেতনায় উদ্দীপ্ত জার্মানরা ইহুদী চোরের অধীনে কাজ করতে রাজী হবে কিনা। এর মধ্যে প্রথম অঙ্কের ডা. ইঙ্গের মা ফ্রাউ রুয়ফকে ফিরিয়ে এনে আর একটা প্রশ্ন তোলা হয়। হিটলার পত্নীরা দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েও কেন বড় বড় ব্যবসায়ী ইহুদীদের তাড়াচ্ছে না? হেলপাখ এর উত্তর দিতে পারে না। দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বার ভয়ে তাদের তাড়ানো যাচ্ছে না। কিন্তু গরীব সাধারণ ইহুদীদের বা সরকারি চাকুরীদের তাড়িয়ে দিলে জার্মানরা সেখানে ঢুকতে পারে। এজন্য হাসপাতালের কর্মী সিমনকে বরখাস্ত করতে হবে। ক্রমে হেলপাখ মামলকের কথার ভিতর থেকে কয়েকটি শব্দ প্রসঙ্গহীন ভাবে বেছে নিয়ে তাকে দোষী করে। নিরাপত্তার ভয়ে অন্যান্যরা হেলপাখের আনা অভিযোগপত্রে সই করে। একমাত্র ইঙ্গে তা করে না। মামলক পিস্তল বের করে নিজের বুকে গুলি করেন।

প্রোফেসর মামলককে প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র করে এ নাটকে জার্মানদের জাতি বিদ্বেষকে তুলে ধরা হয়েছে। সমস্ত নাটকটি জার্মান পরিস্থিতির মধ্যে দেশীয় অবস্থারও চিত্র। ডা. ইঙ্গের

রলফের প্রতি সহৃদয়তার দৃশ্য দেখিয়ে নাটকে কিছু human interest আনবার কাজ হয়েছে। কিন্তু গোটা নাটকটি রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই লেখা। সে অর্থে রাজনৈতিক নাটক। জার্মান দেশের পটভূমিকায় লেখা উৎপল দত্তের আর একটি বিখ্যাত নাটক ‘ব্যারিকেড’। ‘ব্যারিকেড’ ইয়ান পেটার্সেন এর লেখা ‘উনসেরে স্ট্রাসে’ থেকে নেওয়া। এ নাটকের পটভূমিকা ১৯৩৩ এর জার্মানীর, লক্ষ্য ১৯৭২ এর পশ্চিমবঙ্গের। পশ্চিমবঙ্গে তখন বামফ্রন্ট ক্ষমতা হারিয়েছে। ১৯৬৭ সালে প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভা শেষ হবার পর ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থ শংকর রায় মন্ত্রী সভা গঠন পর্যন্ত একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা চলেছে। এই সময়ে তিনবার অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, একবার প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তিনবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে। এই অস্থিরতার কথা নাটকে আছে এ নাটকের গঠন রীতিতে প্রথমেই দেখি সূত্রধার মঞ্চে এসে ‘লাল ফৌজের গান’ গাইছেন, আর একজন বাঙালি শ্রমিক তার সঙ্গে এসেছেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শকে বিদেশী তত্ত্ব বলে বর্জন করার প্রবণতার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবনা পর্বে কথা উঠেছে। “বিপ্লবের গানে আবার দেশী-বিদেশী কি।”^{৯৯} সূত্রধার একথা বলছেন— তারপরই বলা হয়েছে আজকের পালার নাম ‘ব্যারিকেড’— এটা জার্মানীর গল্প। পর্দা উঠতেই দেখা যায় কার্টুনের আকৃতিতে আটো, ল্যান্ট, লিপার্ট, স্ট্রুবেল, ফস এবং ইংগেবর দাঁড়িয়ে আছে। এরা নিজেদের পরিচয় নিজেরাই দিয়েছে। এরা নানা পেশার লোক কিন্তু কেউ ‘রাজনীতি’ করে না। সূত্রধার শ্রমিককে বলছে “নিজের কথা ভাব, স্বদেশের কথা চিন্তা কর। ১৯৩৩ এর জার্মান জনগণের কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না।”^{১০০} এতেই বোঝা যায় নাট্যকারের লক্ষ্য স্বদেশ এবং স্বজন। নাটকের শুরুতেই ইয়ান পেটার্সেন এর কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে। ডাক্তার, বিচারপতি, গৃহবধু, ধর্মযাজক, সাংবাদিক সর্বপ্রকার বুদ্ধিজীবী—কেউই ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। এ নাটকের ৮টি উপবিভাগ। অঙ্ক বা দৃশ্য নাম দেওয়া নেই। প্রস্তাবনা অংশেই দেখা গিয়েছিল ‘সর্বাধিক প্রচারিত নিরপেক্ষ সংবাদ পত্রের সম্পাদক ল্যান্ট ফোন করে সাংবাদিক অটো বিরখোলৎসকে রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন। রাষ্ট্রপতি হিটলারকে ডেকেছেন, বিরাট কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এই প্রস্তাবনা অংশটিকে Hudson কথিত Intial Incident বলা যায়। প্রথম অংশে যোসেফ ৎসাউরিৎসের খুন নিয়ে কাহিনীর শুরু। তার আগেই সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস জার্মান রাজনীতির পরিস্থিতি বর্ণনা করেছে। সেও Intial Incident এর মধ্যে পড়ে। হাইনরিশ ল্যান্ট সাংবাদিক অটোকে পাঠান এই খুনের ব্যাপারে খবর সংগ্রহ করতে। তিনি অটোর মাথায় এ কথাটা ঢুকিয়ে দেন যে কমিউনিস্টরাই -এ খুনটা করেছে। এই দৃশ্যকে exposition বলা যায়। এরপর দ্বিতীয় দৃশ্যে নাৎসী লিপার্ট এর বক্তৃতা এবং interview এবং তৃতীয় দৃশ্যে যোসেফ ৎসাউরিৎস এর স্ত্রী ইঙ্গেবর এর সঙ্গে অটোর কথোপকথনে কমিউনিস্টদের

উপরেই সন্দেহের তীর উদ্যত হয়। এ দৃশ্যগুলি rising action এর কাজ করে। চার নং অংশে বিচার; কিন্তু বিচার ব্যবস্থার স্বাধিকার আর নেই। বেতার এবং চিত্রীরা আদালতে হট্টগোল করছে। ডাক্তার স্ট্রুবেল নিজের অভিমত দিতে চায় না সে বলে “অভিমত বস্তুটি বিপজ্জনক।”^{১১} দেশে বই পোড়ানো হচ্ছে। আদালতে ছটিগকে দায়রা সোপর্দ করা হল। তার পক্ষে কোনো আইনজীবী নেই। নাট্যকার এ নাটককে ঠিক মডেল মেনে গঠন করেননি। বরং তিনি ফ্যাসিবাদের ক্রম প্রসারণ দেখাতে চান। কাজেই এর পরের অংশে পাঁচ নং উপবিভাগে দেখি সম্পাদক ল্যান্ট কীভাবে সব সত্য বিসর্জন দিয়ে নাৎসি তোষণ শুরু করেছেন। সংবাদপত্রে সংবাদকে টুইস্ট করে প্রচার করছেন। অটো বিরখোলৎস এই পরিস্থিতিতে ওসারিৎসের খুন নিয়ে আরো তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করে কমিউনিস্টদের আড্ডায় যায়। এই দৃশ্য রচনা করে নাট্যকার জার্মান দেশের প্রেক্ষিতকে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের প্রেক্ষিত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ছয় নং উপবিভাগে এই কমিউনিস্টদের কথা দেখানো হয়। এ পর্যন্ত কাহিনীকে rising action এর মধ্যেই রাখা দরকার। কেননা এ পর্যন্ত conflict দু’দিক থেকে বাড়ছে কিন্তু তা কোথাও চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব তৈরি করেনি। সাত নং দৃশ্যে আবার বিচার এর দৃশ্য। এখানেই অটো বিরখোলৎস তার সন্দেহ এবং যুক্তি ব্যক্ত করে। ফলে ওসারিৎস এর হত্যা মামলা এক অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। ইংগেবর খুশী হয়। বিচারক ফস ছটিগকে বেকসুর খালাস দেবেন বলে জানান। কিন্তু ফ্যাসিবাদ এবার আরও চেপে বসে। অটো বিরখোলৎস এর তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটনের ফলে চতুর্থ দৃশ্যে কাহিনীর যে অভিমুখিতা দেখা দিয়েছিল তা বেশ একটা নাট্য কৌতূহল তৈরী করে নাট্যকাহিনীকে উদ্দীপক করে তোলে। একে কাহিনীর বিপরীতমুখী পরিবর্তন বলতে পারা যায়। কিন্তু আরও এক চমক ছিলো বাকি। আদালতে হেস জানায় ছটিগকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করা হয়েছে। লিপার্ট জানায় প্রধানমন্ত্রী হিটলারের আদেশেই এটা হয়েছে। এই দৃশ্যে বস্তু বিচার ব্যবস্থার উপরেও প্রশাসনের কর্তৃত্ব দেখা যায়। অর্থাৎ হিটলারের প্রশাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সব গণতান্ত্রিক শক্তি ও পথকে রুদ্ধ করে ফেলেছে। একেই এ নাটকের climax বলা দরকার। অষ্টম দৃশ্যে দেখা যায় বিচারপতি ফস খুন হয়েছেন। ল্যান্ট এর কাগজ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ডাক্তার স্ট্রুবেল, অটো বিরখোলৎস নাৎসি রক্ত চক্ষুর ভয়ে আর সাক্ষ্য দিতে চায় না। ইংগেবরকে দুর্বল করে দেওয়া হয় তার ছেলে অর্ধমৃত শাল পাউলকে মঞ্চে এনে এবং পরে গুলি করে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত একে একে স্ট্রুবেল, অটো, ইংগেবর কমিউনিস্টদের ব্যারিকেডে এসে যোগ দেয়—কেননা মত প্রকাশ না করেও নাৎসিদের জার্মানীতে বাঁচা যায় না। তাদের একটা পক্ষ নিতেই হবে। ইংগেবর বলে “হাঁটু গেড়ে বাঁচার চেয়ে দাঁড়িয়ে মরা ভাল।”^{১২} এ নাটকে রাজনীতির প্রচার অত্যন্ত স্পষ্ট কিন্তু

অটো বিরখোলৎস এর সংলাপে সারাক্ষণ একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ খচিত হাস্য বজায় থাকে। ডা. স্ট্রুবলের সংলাপে স্বভাবত ভীত বুদ্ধিজীবীর আচরণেও একটা হাস্যরসের আস্তরণ মেলা থাকে। এমনকি মরণাপন্ন যোদ্ধা কমিউনিস্টদের কথায় কথায় থাকে ঠাট্টা পরিহাস বিদ্রূপ। ল্যান্ট যেভাবে সংবাদপত্রের story করতে নির্দেশ দেন—তাও বিদ্রূপাসক্ত। তবে দীর্ঘ সংলাপে রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ যতই পরিহাস সিক্ত হোক না কেন বিবৃতিধর্মী হবার ফলে তা নাট্যগুণের অন্তরায় হয়ে ওঠে।

এ নাটকে নাট্যগুণ যতটা তার চেয়ে নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রচার—বাংলায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে প্রচার বেশি। উৎপল দত্ত নিজেই প্রচার বিলাসী নাট্যকার। ইস্তেহারের মতন নাটক লেখেন। এ নাটক কিংবা ‘প্রফেসর মামলক’, ‘অঙ্গার’ কিংবা ‘কল্লোল’ সবক্ষেত্রেই প্রচার ধর্ম অব্যাহত। তবে নাটকের উপস্থাপনায়, সংলাপের গুণে, অভিনয়ের নৈপুণ্যে দর্শকের কেবল প্রচারটাকে মনে থাকে না—তারা আনন্দটাও পায়। উৎপল দত্ত যাকে বলেছিলেন affiliation under stress—সে আনন্দ পায়ই; সঙ্গে থাকে তত্ত্ব এবং রাজনীতি। তা দর্শককে ভাবায়—কেবল অভিভূত করে না।

গঠনশৈলী : নাটকের গঠনে উৎপল দত্তের শিল্প নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা নাটকের পথ চলা শুরু হয় ইংরেজি নাটকের হাত ধরে। তাই বাংলা নাটকের গঠনশৈলীতে ইংরেজি নাটকের প্রভাব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে অনেক বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের গঠন শৈলীরও প্রভাব রয়েছে। এ বিষয়ে ড. চিত্তরঞ্জন লাহা মহাশয় বলেছেন—

“ইংরেজি নাটকের অভিনয় ও ইংরেজি শিক্ষার প্রেরণায় বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। একথা যেমন সত্য, বাংলা নাটকের সংগঠন রীতিটি যে তিনটি (ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা যাত্রাগান) রীতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে একথাও তেমনি সত্য। জন্ম লগ্ন থেকেই বাংলা নাটকের সংগঠন রীতিতে এই তিনটি পৃথক রীতির সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়।”^{১৩}

আবার মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় ‘নবান্ন’ নাটক সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন — “একটা বিশেষ জীবনবোধ থেকে নবান্নের সৃষ্টি বলে এর সব কিছু দায়বদ্ধতা জীবন ও মানুষের প্রতি; সচেতন চারু বিকাশের শিল্পকলার প্রতি নয়। শিল্প এখানে জীবনের ও মানুষের জন্য, শিল্পের নন্দিত রসচর্চনার জন্য নয়।”^{১৪}

উৎপল দত্তের নাটকগুলির গঠনশৈলীর ক্ষেত্রেও উক্ত কথাগুলি একই ভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। তিনি মার্কসবাদী চিন্তা চেতনাকে তাঁর সমস্ত নাটকেই প্রয়োগ করেছেন। তাই

তাঁর নাটকে দেখা যায়, সমকালীন যুগমানসের বহিঃপ্রকাশ।

উৎপল দত্তের নাটকের গঠনশৈলীর বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে একটি দিক হল অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন রীতি। নাটক রচনা এবং অভিনয়ে উৎপল দত্ত শেক্সপিয়ারকে অনুসরণ করলেও পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট উনিশ শতকীয় রীতিকে বর্জন করে গণনাট্য-নবনাট্য কালের দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাজন রীতিকে গ্রহণ করেছেন তাঁর নাটকে। তাই তাঁর নাটকে যেমন একটি মাত্র দৃশ্যের নাটক রয়েছে। তেমনি আবার পনের দৃশ্যের নাটকও রয়েছে। যদিও বেশিরভাগ নাটকেই তিনি ‘অঙ্ক’ বা ‘দৃশ্য’ শব্দের ব্যবহার করেননি। ‘বাংলা ছাড়ো’, ‘ভুলিনাই প্রিয়া’ নাটক দুটিতে অঙ্ক বিভাজন রয়েছে। ‘বাংলা ছাড়ো’ নাটকে একটি অঙ্ক এবং ‘ভুলিনাই প্রিয়া’ নাটকে পাঁচটি অঙ্কের ব্যবহার দেখিয়েছেন। ‘মধুচক্র’ ও ‘প্রফেসর মামলক’ নাটকে যথাক্রমে তিনটি ও চারটি অঙ্কের ব্যবহার রয়েছে।

শুধু তাই নয় কয়েকটি নাটকের শেষে ‘পরিশিষ্ট’ অংশেরও সংযোজনা দেখা যায়। যেমন ‘মানুষের অধিকারে’, ‘রাতের অতিথি’ প্রভৃতি নাটক। কোন কোন নাটকে বিভিন্ন দৃশ্যের নামকরণও দেখা যায়। যেমন—‘মানুষের অধিকারে’; ‘হিন্মৎবাই’, ‘সমাধান’, ‘তীর’, ‘দ্রুশবিদ্ধ কুবা’, ‘যুদ্ধংদেহি’, ‘নয়াজমানা’, ‘লেনিন কোথায়’? ‘কৃপান’ প্রভৃতি। ‘মাও-ৎসে-তুং’ নাটকে দেখা যায় এক একটি ‘দৃশ্য’ এক একটি ‘চিত্র’ নামে দৃশ্যায়িত হয়েছে।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে নাটকের একটা পার্থক্য রয়েছে। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, শ্রবণ অথবা পাঠের মাধ্যমে আনন্দ করা হয়, কিন্তু নাটক পাঠ-শ্রবণ ছাড়াও দর্শনের মাধ্যমে আনন্দ করা হয়। আর একটি নাটককে দর্শনযোগ্য করে তোলা হয় অভিনয়ের মাধ্যমে। এ অভিনয় করার জন্য প্রয়োজন মঞ্চের। নাট্যকারের কল্পনার জগৎ দৃশ্যরূপ ধারণ করে মঞ্চের অভিনয়ে। দর্শক এই দৃশ্যরূপের বাস্তব রসে মগ্ন হয়। “মঞ্চের বাস্তব জগৎ বিধাতার সৃষ্ট বাস্তব জগৎ নয়। কলা কৌশলে রচিত বাস্তব জগৎ - অর্থাৎ বাস্তব জগতের illusion অথবা মায়া মাত্র। এই মায়া সৃষ্টি করাই হল রঙ্গমঞ্চের উদ্দেশ্য।”^{১৫}

নাট্যকারকে মঞ্চের মাধ্যমেই দর্শকের কাছে পৌঁছাতে হয়। তাই তিনি স্বাধীন ভাবে তাঁর নাটকের রূপ দান করতে পারেন না। তাঁকে বারবার মঞ্চের কথা ভাবতে হয়। মঞ্চের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্যই অনেক সময় নাট্যকার যা দেখাতে চান তা সার্থক ভাবে দেখাতে পারেন না, তিনি যা বলতে চান তা পরিপূর্ণ রূপে বলতে পারেন না। আর সেকারণেই প্রয়োজন হয় মঞ্চসজ্জা, মঞ্চ নির্দেশনার মতো বিষয়গুলির।

নাট্যকার পরিচালক উৎপল দত্ত তাঁর নাটক গুলিতে এই মঞ্চ নির্দেশনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন নাটকগুলি আলোচনা সূত্রেই বিষয়টি প্রকাশিত হবে।

উৎপল দত্তের নাটক সমগ্রের তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত ‘তীর’ এবং ‘ক্রশবিদ্ধ কুবা’ নাটক দুটির প্রথমে ‘প্রস্তাবনা’ অংশ আছে। নাটকের শুরুতে লিখিত এ অংশগুলির মাধ্যমে নাট্যকার মঞ্চনির্দেশনা প্রদান করেছেন। ব্যারিকেড নাটকের ‘প্রস্তাবনা’ অংশে কুশীলবদের পরিচয় দিয়ে নাটক শুরু করা হয়েছে।

‘তীর’ নাটকের ‘প্রস্তাবনা’ অংশে কৃষক আন্দোলনের সশস্ত্র মিছিলের বর্ণনা রয়েছে। নাটকটির শুরুতে শুভ্রা টুডুর মাদল বাজানো, তার পেছনে লাল ঝাঙা নিয়ে বির্সা ও গজুয়া ওরাওঁ এদের পেছনে অন্যান্য সদস্য সদস্যা; কেউ তীর-ধনুক হাতে, কেউ বল্লম-ছুরি হাতে নিয়ে মিছিল করে ধ্বনি তুলছে—এ বর্ণনার মাধ্যমেই লুকিয়ে আছে নাট্যকারের মঞ্চ নির্দেশনা; কোন আবহে নাটকটির ঘটনা ক্রমশ অভিনীত হবে তার প্রকাশ।

‘ক্রশবিদ্ধ কুবা’ নাটকটির শুরুতেও দেখা যায় কুবা-র এক বিরাট মানচিত্র। একটি গবাক্ষে ফিদেল কাস্ত্রো আর একটি গবাক্ষে মেয়র সিলভানা এস্ত্রেমাদা। জানালার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে দুই নবীন বিপ্লবী। এ সবকিছুই যেন ঈস্টার উৎসবের আয়োজন। নাট্যকারের এ বর্ণনার মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে তাঁর মঞ্চনির্দেশনার কথা। এছাড়াও প্রায় প্রতিটি নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যের শুরুতে নাটকের চরিত্রগুলির স্থান-কাল ঘটনার যে বর্ণনা রয়েছে তাতে অবশ্যই নাট্যকারের মঞ্চ নির্দেশনা প্রকাশ পায়।

‘ফোরারী ফৌজ’ নাটকের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চনির্দেশনায় নাট্যকার বলেছেন—

“ভুবন ডাঙ্গা গীর্জা ময়দানে হাজাগ বাতির নীলাভ আভায় যাত্রা হচ্ছে। অদূরে গোথিক কায়দায় গীর্জার দরজা। পালার নাম সমাজ, রচয়িতা মুকুন্দ দাস। বৃদ্ধেরা বসেছে রোয়াকের উপর, জমিদার বাবুর আশেপাশে। ছেলে বুড়ো কৃষকের দল বসেছে মাটির উপর। চিকের পেছনে মেয়েরা। পালা জমে উঠেছে। বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তার পঞ্চমে আকুল স্বর। দর্শকরা হায় হায় করে উঠেন। গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করেন এক দীর্ঘাকায় পুরুষ, গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি পরা। দেশমাতৃকা বন্দনা করছেন বিবেক। চোখে জল আসে দর্শকের।”^{৯৬}

বিবেকের গান শুনে কিন্তু মঞ্চনির্দেশনা অনুসারে দর্শকদের চোখে জল আসেনি বরং গানের কথা তাদের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

“কৃষক (১)। কেডারে? গান গাইয়া আগুন জ্বলাইয়া দেয় কেডারে?”

কৃষক (২)। মায়ের দুধ খাইছিল বটে।”^{৯৭} নাট্যকার দর্শকদের চোখে জল আনতে চাননি তাদের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চেয়েছিলেন। এই উপস্থাপনা নাটকের পরবর্তী বিষয়বস্তুর মূল কথা

যে আগুন জ্বালানোর বিষয় হবে—তার আভাস দেয়। নাটকের শুরু এই কৃষক ও সাধারণ মানুষের মুখের কথা দিয়ে, তার শেষও তাই। “শান্তি রায় অমর। শান্তি রায়ের মৃত্যু নাই।”^{৯৮} এই কথা দিয়েই নাটকের শেষ হয়। নাটকের উপস্থাপনা ও পরিণতি এই ভাবে মিলে যায়।

এরপর চরিত্রের সংলাপ দিয়ে নাটকটি শুরু হয়েছে। নাট্যঘটনা এভাবে যতই এগিয়ে চলে মঞ্চনির্দেশনাও তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। হঠাৎ করে উত্তেজিত জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে আবার বিবেক নজরুলের গান গাইতে গাইতে তার উত্তরীয় মেলে ধরেন। দর্শকরা অনেকে পয়সা ছুড়ে দেয়, মহিলারা হাতের বালা খুলে দেয়- এভাবে সমগ্র দৃশ্যে আরো অনেক নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। শুধু মঞ্চের সাজ-সজ্জাই নয়, চরিত্রগুলির আকৃতি-প্রকৃতি, পোশাক-আশাক, সব কিছুই পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ নাট্যকার তাঁর নাটকের মধ্যে বর্ণনা করে গেছেন। এরকম মঞ্চনির্দেশনা উৎপল দত্ত তাঁর প্রতিটি নাটকেই কম-বেশি বর্ণনা করেছেন।

উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যঘটনায় গতি সৃষ্টি করতে গিয়ে ঘটনার আবর্তের পর আবর্ত হাজির করে দর্শকের মনকে কৌতুহলী ও উত্তেজিত করে তুলেছেন। নাট্যঘটনার মধ্যে তিনি ঐক্যবদ্ধ রূপ দান করেছেন; বৈচিত্র্য ও জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয় নাটকের প্রতিটি দ্রিগ্যা ও প্রতিটি চরিত্রকে অনিবার্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন।

উৎপল দত্তের নাট্যঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি। এক শক্তি নাট্যঘটনাকে কেন্দ্রের দিকে ধরে রাখে, আর এক শক্তি কেন্দ্র থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়। কেন্দ্রের সাথে যোগ রেখেও তিনি কৌশলে বহু বিস্তৃত, জটিল ঘটনাজাল রচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নাট্যকাহিনীকে অধিকতর কৌতুহলোদ্দীপক করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আবার নাটকের মূল ধারার সঙ্গে যোগ রেখে বিভিন্ন উপধারা সৃষ্টির মাধ্যমে কাহিনী রচনার কৌশলগত শিল্প নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। “সেই ঘটনাই নাটকের ঘটনা হতে পারে যার প্রভাব বিস্তার করবার সংকট সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে।”^{৯৯} উৎপলের নাট্যঘটনাও এর ব্যতিক্রম নয়।

নাট্যঘটনা সজ্জার ক্ষেত্রে কোন কোন নাটকে দেখা যায় মূল কাহিনীর পাশাপাশি এক বা একাধিক উপকাহিনী রয়েছে। উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর যোগ রক্ষা করেছেন। তাছাড়া কাহিনী-উপকাহিনীর পরিণতিগত সাদৃশ্যের দিকটিও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

উৎপল দত্তের বেশ কিছু নাটকে প্রাককথন রীতির ব্যবহার দেখা যায়। সপ্তম খণ্ডের ‘বণিকের মানদণ্ড’ নাটকের প্রথমে ‘প্রাককথন’ অংশ আছে। আবার অষ্টম খণ্ডের ‘ভুলিনাই প্রিয়া’ ও ‘মাও-ৎসে-তুং’ নাটকের শুরুতে ‘সূচনা’ নামক অংশ রয়েছে। এ থেকে নাট্যকারের নাটক

রচনার অভিপ্রায় বোঝা যায়। তিনি কী কারণে নাটকটি রচনা করেছেন তার একটা প্রেক্ষাপট জানা যায়।

‘বণিকের মানদণ্ড’ নাটকে দেখা যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে একশ্রেণীর অসৎ লোক বিকৃত করেছে। অপরদিকে ইংরেজ শাসকদের মহৎ করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস অন্য কথা বলে। তাই উৎপল দত্ত নিজেই বলেছেন—

“ভারতের ইতিহাসের এই পুনর্ব্যাখ্যার বিশদ প্রয়োজন, যখন কিছু ভাড়াটে কলম-পেশা নেহাতই ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থে ব্রিটিশ শাসক নামধারী কিছু ফাটকাবাজ, লুটেরা জালিয়াত-মুনাফাবাজ এবং অবশ্যই খুনী স্বেচ্ছাচারীর মরণোত্তর তোষণে নিযুক্ত। উত্তর-প্রজন্মের এই ভাড়াটে লেখকরা ভাগ্যবান, কারণ পৃষ্ঠদেশে প্রবল আঘাতের নির্মম অভিজ্ঞতা এদের হয়নি। তাই এদের মসীলিগু কলমে জোবচারণক, রবার্ট ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস গরিমাদীপ্ত।”^{১০০}

‘ভুলিনাই প্রিয়া’ নাটকে দেখা যায় ‘সূচনা’ নামের একটি অংশ আছে। এতে সূত্রধার তার কথার মাধ্যমে নাটকের অভিনেয় বিষয় কী হবে তা ব্যক্ত করেছে। সিরাজদ্দৌলার শাসনকালে মুর্শিদাবাদ নগরীর পটভূমিকায় এ নাটক। সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোয় দুই পরিবারের প্রেমিক প্রেমিকার অকৃত্রিম মানবধর্ম পালনের ট্রাজেডি যে সমগ্র নাটক জুড়ে অভিনীত হবে সেকথা সূত্রধার নাটক শুরুর আগেই বলে দিয়ে শ্রোতা-দর্শকদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছে।

‘মাও-ৎসে-তুং’ নাটকের ‘সূচনা’ অংশে ওয়েই চরিত্রটি মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসের কথা সূত্রে বলেছে যে কীভাবে মার্কিন ও জাপানিরা চীনকে শোষণ করেছে এবং শোষিত চীন কীভাবে সুন-ইয়াং-সেনের নেতৃত্বে উঠে দাঁড়ায়। এই ‘সূচনা’ অংশ প্রায় ‘প্রাককথন’ অংশের মতোই। দুটিই নাটক শুরুর আগে দর্শককে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে তোলে।

নাটক তথা নাট্যঘটনাকে দর্শকের কাছে পূর্ণাঙ্গ রূপে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন আলোর যথাযথ ব্যবহার বা আলোক সম্পাত। এই আলোক সম্পাতের মাধ্যমেই মঞ্চে মায়া সৃষ্টি করা হয়। প্রয়োজন মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে, অভিনেতাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবাবেগের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং অভিনয়ক্ষেত্র বহির্ভূত দূরবর্তী জগতের আভাস দর্শক চিত্তে সঞ্চার করার জন্য আলোকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

কোন দৃশ্যকে আলোকোজ্জ্বল করার জন্য একটি বিশেষ স্থানকে তীব্রভাবে নির্দিষ্ট করতে, কোন বিশেষ রঙের সমাবেশ করতে, কিংবা প্রায় অন্ধকার স্তর থেকে আলোক ঝলসানো দীপ্তির স্তর পর্যন্ত আলোর নানা তারতম্য সৃষ্টি করতে নাট্যমঞ্চের আলোক সম্পাত দর্শকচিত্তে মায়াজাল

বিস্তার করতে সক্ষম। দর্শকের “মন প্রভাবিত হয় তখন যখন আলোকিত বস্তুর পার্শ্ববর্তী পরিবেশ স্বল্পালোকিত অথবা ছায়াছন্ন থাকে। আলো ও ছায়ার এই সহ অবস্থিতি না থাকলে দর্শক চিত্তে মায়াজাল বিস্তৃত হতে পারে না।”^{১০১} নাট্যকার উৎপল দত্তের নাটকগুলিতেও এই আলোক সম্পাতের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। নাট্য সংলাপের মধ্যেই এই আলোক সম্পাতের কথা নিহিত আছে। তাঁর ‘অঙ্গার’ ও অন্যান্য কয়েকটি নাটকের চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্যেই ধরা পড়েছে নাটকে আলোক সম্পাতের বিষয়টি।

‘অঙ্গার’ নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় আলোর যাদুকরী মায়ার কথা। খনির গহুরে কয়েকজন মানুষ আটকে পড়েছে। খনির মালিক তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা না করে বরং তার উন্টেটা করে—জল ঢেলে খনি গহুরে মানুষগুলিকে চিরদিনের মতো ডুবিয়ে দিচ্ছে। খনির প্রায় অন্ধকার গহুর, ধীরে ধীরে কালো জল বাড়ছে, হাটু থেকে কোমর, কোমর থেকে বুক, বুক থেকে গলা পঁাকে পঁাকে জল ফুসে উঠছে। শোনা যাচ্ছে তার গর্জন। আর সেই গর্জন ছাপিয়ে চরিত্র গুলির শেষ সংবাদ পৃথিবীর মানুষের কাছে আছড়ে পড়ছে।

চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্যেই ধরা পড়ে আলোক সম্পাতের বিষয়টি। “খনির অন্ধকার গর্ভে চক্রান্তকারী নিষ্ঠুর শোষক শ্রেণীর কৌশলে ভয়ংকর শীতল মৃত্যুর থাবায় যন্ত্রণামুগ্ধ মানুষগুলির এই সংলাপ প্রেক্ষকের মনে যে ‘মুড’ সৃষ্টি করতে পারে মঞ্চের আলোক সম্পাত- এর ব্যতিরেকে তা যথার্থ সম্ভব হত না বলেই বিশ্বাস।”^{১০২} অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে আরো বলেছেন—“আবহ সংগীত ও আলোর জাদুতেই মনে হয় সংলাপগুলি ভয়াবহ -নিষ্ঠুর-নির্মম জীবন পরিণামের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সঞ্জাত কঠিন সত্য।”^{১০৩}

মঞ্চের কাজ হল নাট্যকাহিনী যে স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে, সেই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতটি ফুটিয়ে তোলা। তার জন্য প্রয়োজন হয় দৃশ্যপটাদি, সংগীত, আলো প্রভৃতি যার সহায়্যে দর্শকের কাছে এমন এক মায়াময় মঞ্চ তৈরী হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা যখন নাট্য সংলাপগুলি উচ্চারণ করে বা নাটকের ‘অ্যাকশান’গুলি যখন দেখানো হয় তখন তা সত্যি হয়ে উঠে।

সংলাপ ঃ নাটকীয় চমক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির পাশাপাশি তীক্ষ্ণসংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও উৎপল দত্ত স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। সত্য কথাটিকে সহজভাবে সরাসরি বলার দুঃসাহস তাঁর মধ্যে ছিল। তাই দেখা যায় তাঁর নাটকের সংলাপে-সংলাপে রয়েছে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মিশ্রণ; বিনোদনের সঙ্গে শ্রেণী সচেতন শিল্প কর্মের মিলন। তার পাশাপাশি রয়েছে বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী থেকে নিরক্ষর মানুষ, সকলকেই মনোযোগী করে ধরে রাখবার শেক্সপিয়ারীয় জাদু। এই অবাধ

করে দেওয়ার ক্ষমতার বলেই তিনি বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটুও আপোষ না করে পেশাদার থিয়েটারের জগতে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছেন।

নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাটকগুলিতে নাট্যসংলাপ রচনা করতে গিয়ে মার্কসবাদী মতাদর্শকে প্রধান্য দিলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি শিল্পরসকে ক্ষুন্ন হতে দেন নি।

সংলাপ হল নাট্য চরিত্রের প্রাণশক্তি। নাট্যচরিত্র এবং নাট্যকাহিনীকে কেবলমাত্র সংলাপের মাধ্যমেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। চরিত্রের সংলাপ দর্শক মনে কৌতুহল বা প্রশ্ন কিংবা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রত্যুত্তর সংলাপ সেই কৌতুহলকে জাগিয়ে রাখে বা প্রতিক্রিয়ার রেশ টেনে নিয়ে চলে যায়। নাট্যকার চরিত্রের সংলাপ রচনায় প্রথম থেকেই দর্শকমনে বিশেষ কৌশলে একটি ঘটনা বা বৃত্তান্ত বা অবস্থাকে জানবার জন্য কৌতুহলের শিখা জ্বালিয়ে রাখেন।

নাট্যচরিত্রের সঙ্গে দর্শকের ভাবানুভূতির নিবিড় যোগ তৈরি করতে প্রয়োজন যথার্থ সংলাপের। নাট্য গুণাঙ্কিত সংলাপে দেখা যায় অভাবিত অপ্রত্যাশিত সংবাদ যা দর্শককে সহজেই কৌতুহলী করে তোলে। নাট্যসংলাপের ধর্মই হল জীবনগতির দ্বারা উজ্জীবিত হওয়া, জীবন গতিশীল নাট্যচরিত্রের কথাবার্তার মধ্যে সেই গতিশীল জীবনই আলোকিত হয়। “সংলাপ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-উন্মোচক। সংলাপের সাহায্যে চরিত্র আপন স্বভাব ও প্রকৃতিকে মেলে ধরে। চরিত্রের নিজস্ব বাগ্ভঙ্গী হল সংলাপ, যার সাহায্যে বক্তার স্বভাব প্রকৃতি রুচি, শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।”^{১০৪} নাট্যকার উৎপল দত্তের নাট্যসংলাপে রয়েছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ। এছাড়াও নাট্যসংলাপের ভাষার রূপ ও রীতির প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এই রিয়ালিজমের যুগেও তিনি গদ্যবন্ধ সংলাপের পাশাপাশি পদ্যবন্ধ সংলাপের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কখনোই উপেক্ষা করেননি। নাটকের ভাব, বক্তব্য এবং পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে তিনি পদ্যবন্ধ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’, ‘এবার রাজার পালা’, এসব অতি সাম্প্রতিক এবং সংকট-সমস্যা পূর্ণ; রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাপূর্ণ নাটকেও তিনি গদ্যের পাশাপাশি পদ্যবন্ধ সংলাপের ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে পদ্যবন্ধ সংলাপের শক্তি কোথায়?

শিল্প দক্ষতার পাশাপাশি উৎপলের নাট্যসংলাপে প্রচার ধর্মিতারও প্রকাশ দেখা যায়। নাট্য চরিত্র যখন নিজের কথা না বলে অন্যের কথা বলে তখনই সে নাট্যকারের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রবক্তা হয়ে ওঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় চরিত্রের সংলাপ কিছু সংখ্যক দর্শককে মজা দিলেও পরিস্থিতি, ঘটনা এবং চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ মনে হয় না। সংলাপের এরকম দুর্বলতার কারণ হল—নাট্যকার চরিত্রকে স্বাভাবিক ভাবে, স্বাধীন ভাবে কথা বলতে দেননি, চরিত্রের মধ্যে নিজের ভাবনা চিন্তার কথাগুলিই বসিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ‘টিনের

তলোয়ার’ নাটকে মেথরের সঙ্গে বেণীমাধব চরিত্রের কথোপকথনে দেখা যায় চরিত্রগুলি যেন নিজের কথা বলছে না, অন্য কারো কথা বলছে। ম্যানহোলের বালতি ভরতি ময়লা বেণীর পায়ে ঢেলে দেয় মেথর, কিন্তু বেণী চটে না গিয়ে বরং তাকে আপনি বলে সম্বোধন করে—“আপনি থিয়েটার দেখেন?”^{১০৬} এখানে গরীব মেথরকে ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের সাম্যবাদী মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছে, সেই সঙ্গে বেণী চরিত্রের সংলাপে অসংগতি ধরা পড়েছে। “অশিক্ষিত, মূর্খ, অন্ত্যজ শ্রেণী বলে মেথরকে অবজ্ঞা নয়- সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের প্রতিই শ্রদ্ধা-ভালোবাসা মার্কসবাদী উৎপল দত্তের রাজনৈতিক চেতনা থেকেই এরূপ কথাবার্তা বেণীর সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে।”^{১০৬}

এই মেথর চরিত্রটি পরিচালক বেণীমাধবকে আবার অভিযোগ জানিয়ে বলে—

“মুখে রং মেখে চক্রবেড় ধুতি পড়ে, লাল নীল জোড়া আর ছত্রি পরে রাজা-
উজীর সাজো কেন? এত নেকা পড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলে মানুষি
করো কেন?... যা আছে তাই সাজো না। গায়ে বিষ্ঠা আর কাদা লেগে আছে
দেখছ?... সেটা দেখাতে নজ্জা হয় বুঝি? তাই চকচকে পোশাক পড়ে চৌগোপ্তা
দাঁড়ি এঁটে রবক সবক কিছু কবিতা বলে ধাপ্পা মারো।”^{১০৭}

একথাগুলির মাধ্যমে বেশ বোঝা যায়, ইউরোপিয়ান ছকে মেলানো আমাদের থিয়েটারে, ইউরোপিয়ান পোশাক-পরিচ্ছদ পরা সিভিল সোসাইটির ভিতরে ধাপ্পাটা, যা মেথরের ‘ধাপ্পা’ কথাটি গভীর থেকে উঠে আসে।

আবার ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধি প্রিয়নাথও বেণীমাধবকে বলে “বাইরে পুরাতন সমাজ বিধবস্ত হচ্ছে আর নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের অলীক স্বর্গ রচনা করে চলেছেন।”^{১০৮} এখানে শিক্ষিত প্রিয় নাথের কাছে যেটা অলীক স্বর্গ, অশিক্ষিত মেথরের কাছে সেটাই হল ‘টিনের তলোয়ার’। মেথর মথুর তাই কাপ্তানবাবুকে চ্যালেঞ্জ করেছে—“কই যুবরাজ ছেড়ে আমায় লিয়ে নাটক ফাঁদতে পারবে? হেঃ চাটুয্যে বামুনের জাত যাবে না তাতে।”^{১০৯} কী অসাধারণ সংলাপ! লক্ষণীয় যে নাট্যকার কী আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্তিতে সংলাপে তাঁর দ্বন্দ্বিক চেতনাকে মিশিয়েছেন।

উৎপল দত্তের নাটকের অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সংলাপের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা। বীরকেষ্টর বাঁধা হয়ে থাকা অভিনেত্রী ময়নার সতীত্ব সম্পর্কে যখন প্রিয়নাথ কিছু প্রশ্ন জানতে চায়, তার উত্তরে কাপ্তানবাবু বলে—“সতীত্ব! সেটা একটা কুসংস্কার যতই সাহেবি পোশাক পড়না কেন, প্রিয়নাথ মল্লিক আসলে তোমার মনটা পড়ে আছে হিন্দুয়ানির আস্তাকুড়ে।”^{১১০}

এই ‘হিন্দুয়ানির আস্তাকুড়ে’ শব্দ দুটির ব্যঞ্জনা সংলাপ টিতে অতিরিক্ত মাত্রা এনে দিয়েছে, যা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টির সহায়ক। উৎপল দত্তের বেশ কয়েকটি নাটকের সংলাপে “আবেগতপ্ত ভাবের সঙ্গে গভীর ভাবনার, বোধের সঙ্গে বোধির, ইতিহাসের চেনা জানা চরিত্রের সঙ্গে অচেনা ইতিহাসের প্রকৃত নায়ক সাধারণ মানুষের আলোকিত সংঘর্ষের ধারা বিবরণী পেয়ে যান। দর্শক কিম্বা পাঠকও।”^{১১১} ‘সূর্য শিকার’, ‘একলা চলোরে’, ‘মহাবিদ্রোহ’, ‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’, ‘আজকের শাজাহান’, ‘জনতার আফিম’ প্রভৃতি নাটকে এমন সংলাপের ব্যবহার দেখা যায়।

আবার ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকে পাওয়া যায় চরিত্রের নিজস্বতা, স্বাভাবিক ও ব্যক্তিত্ব উন্মোচনকারী সংলাপ। সন্ত্রাসবাদী দলের গোপন সভায় অদৃশ্য নেতা শান্তিদার প্রস্তাব সকলে মেনে নিলেও অশোক তা মেনে নেয়নি। তার বক্তব্য—

“অশোক।। সবাই যখন পক্ষে তখন প্রস্তাব গৃহীত হলো। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত আপত্তি রইল। কুমুদ।। কিসের আপত্তি? শান্তিদার ছকুম।

অশোক।। Hero-worship is strongest where human life is cheapest!

শান্তিদাকে কত খানি ভালো বাসি তার প্রমাণ আগেও দিয়েছি। পরেও দেব। তা বলে আমার নিজের মত ঘোষণা করতে কে আমাকে বাঁধা দিতে পারে। দেখতে চাই।”^{১১২}

তাই দেখা যায় উৎপল দত্তের কিছু নাটকের কিছু সংলাপের মাধ্যমে তাঁর নিজের মতাদর্শের প্রচার থাকলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর নাট্যসংলাপ শিল্পগুণে ভরা। তাঁর নাট্যসংলাপে যেমন রয়েছে হাস্যরস তেমনি রয়েছে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের গূঢ়ার্থ ইঙ্গিত, নাটকীয় চমক প্রভৃতি।

এছাড়াও উৎপল দত্তের নাট্যসংলাপের একটি অন্যতম শিল্পগুণ হল নাট্যসংলাপের ভাষা। সংলাপ হচ্ছে চরিত্রের প্রাণের ভাষা-স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক। সংলাপের ভাষা গদ্য হবে না পদ্য হবে, কথ্য হবে না লেখ্য হবে, পরিশীলিত না স্ল্যাং? পরিশীলিত ভাষারই বা রূপ কেমন হবে, গুরুগভীর বিশ্লেষাত্মক নাকি সহজ সরল বেগবান? তারও সুনিপুন প্রয়োগ দেখিয়েছেন উৎপল দত্ত তাঁর বিভিন্ন নাটকে।

বেশির ভাগ নাটক গদ্যে লিখলেও ‘টিনের তলোয়ার’, ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ নাটকে তিনি কখনো কখনো পদ্যভাষার নিখুঁত ব্যবহার দেখিয়েছেন।

‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে গদ্য ও পদ্য রীতির মিশ্র ব্যবহার রয়েছে। সমকালীন যুগমানসে রুচি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নাট্যকার এ রীতি প্রয়োগ করেছেন। আবেগতরল উচ্ছ্বাস পূর্ণ অলীক প্রেমের কাহিনী নিয়ে তৈরী ‘ময়ূরবাহন’ নাটকের অনুরাধাবেশী ময়না এবং ময়ূরবেশী জলদ প্রমুখ চরিত্রের মুখে পদ্য রীতির সংলাপের ব্যবহার দেখিয়েছেন নাট্যকার। শোষণ চরিত্রগুলির শোষণ

করবার উপায়, পরিকল্পনা বিভিন্ন ফন্দি ফিকিরকে আরো সুস্পষ্ট ভাবে বোঝানোর জন্য এরকম সংলাপ যেন উপযুক্ত হয়েছে।

একই রকম বলা যায় ‘তীর’ নাটকের চরিত্রগুলির ‘কথ্য’ সংলাপের ক্ষেত্রে। চরিত্রগুলির শিক্ষাদীক্ষা, গুন, বুদ্ধি পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী দর্শকের সামনে নিখুতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে কথ্য রীতির সংলাপই যথোপযুক্ত। তাদের মুখে চলিত বাংলা বা অন্য কোন সংলাপ ব্যবহার করলে তা সংগতি পূর্ণ হত না। তাই নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট জিনিসের ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। সংলাপ রচনায় নাট্যকারের এটি একধরনের শিল্প নিপুণতার অন্যতম পরিচয়।

ঐতিহাসিক বা নাগরিক সংলাপের বাইরেও ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এর মতো লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা অসাধারণ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে তিনি অক্লেশে ও স্বতঃস্ফূর্ততায় লোকায়ত মানুষের মুখের সংলাপকে জীবন্ত রূপ দান করেন। ‘তামুক খাইবা’^{১১০} অথবা “মালোর মাইয়ার গায়ে হাত দিসে, অরে পুইত্তা ফেলো”^{১১১} ‘তীর’ নাটকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও গ্রামীণ জীবনের জীবন্ত রূপ দেখা যায় সানঝো, শনিচরোয়া সোমারি, উপাসু, শুভ্রা টুডু প্রভৃতি চরিত্রগুলির সংলাপে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উৎপল দত্ত মার্কসবাদ লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই তাঁর নাট্যরচনা এবং নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

“তাঁর মধ্যে ব্রেখ্টের মতোই একটা প্রচ্ছন্ন কবি মন ছিল। তলস্তয় যেমন এক আশ্চর্য কবি মন নিয়ে বিশ্বাস করতেন। কৃষকরা এতকাল ধরে জমিদার শ্রেণীর কাছে এমন নগ্ন নির্লজ্জভাবে শোষিত হয়েছে যে প্রতারিত কৃষকরা যদি জমিদারের বিরুদ্ধে অন্যায়ও করে তবু তা সমর্থনযোগ্য আর—তাই তাঁর চরিত্ররা কখনো সরস কখনও তীক্ষ্ণ সংলাপে ঐ মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে, উৎপল দত্তের লেখা শ্রমজীবী মানুষের চরিত্রগুলি ঠিক তেমনি তাঁর জীবন সংগ্রামের প্রতি তাঁর অমিয় ভালোবাসার অভিজ্ঞান।”^{১১২}

তাছাড়া ‘কল্লোল’ নাটকের সাদুল সিং এবং ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকের অশোক চ্যাটার্জীর কথিত সংলাপগুলি উৎপল দত্তকে নতুন মহিমায় মহিমাষিত করেছে। সাদুল যখন স্টেচার করে শেষবারের মতো তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে, আবার তার প্রতি বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া বাবা-মা ও স্ত্রীর কাছে অশোক চ্যাটার্জী যখন মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় সে মুহূর্তে উৎপল দত্ত যে সংলাপ সৃষ্টি করেছেন তাতে—

“সংগ্রামের পাশাপাশি বিষাদ, ভালোবাসার পাশাপাশি বিপন্নতা, উচ্চারিত

সংলাপের গদ্য অতিক্রম করে এক না বলা কবিতা পাঠক বা দর্শকের গভীর গোপনে দ্বিতীয় স্বরলিপি সৃষ্টি করে। ইতিহাসবীক্ষা, শ্রেণীচেতনা, মার্কসবাদ-কোনো কিছুর থেকেই বিচ্ছিন্ন না হয়ে এক আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ততায় ঐসব সংলাপ নতুন এক বোধের জন্ম দেয়।”^{১১৬}

এখানেই একজন জীবন রসিক নাট্যকারের বহুবর্ণী সংলাপ সৃজনের অপ্রতীম দক্ষতা, অনমনীয় বিপ্লবী মানসিকতা, সংগীত জ্ঞান, নাট্যবোধ, বিশ্ববীক্ষা, এককেন্দ্রিকতার বদলে বহুচরিত্রকে নিয়ে তাঁর সৃজন প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীনতাকামী মানুষের আর্তি ও সংগ্রামই আজীবন ঐতিহ্যবাদী উৎপল দত্তের নাটকের সঞ্জীবনী শক্তি। তিনি তাঁর অনেক নাটকে যাত্রাপালায় সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের যে রূপরেখা অঙ্কন করেছেন ‘কৃপান’ নাটকে সেই তত্ত্বের সামান্য স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায় রাসবিহারী বসুর বক্তব্যে— “.... যারা বলে ইংরেজ মারব এবং হাসিমুখে মরব, তারা বিপ্লব করে না, স্বার্থপরের মতন শহীদ হয়। আমি চাই এমন যোদ্ধা যে বলবে হাসিমুখে ইংরেজ মারব এবং তারপর বেঁচে থাকব আরো ইংরেজ মারবার জন্য।”^{১১৭} আর ‘কল্লোল’ নাটকের সাদুল যখন বলে—“লড়াই সব সময়ে হয় রাইফেল দিয়ে। সব সময়ই তাই হবে। শাদা মালিক, কালা মালিক সবাই ভয় করে এই একটি জিনিসকে -রাইফেল। অহিংস লড়াই কথাটা স্ববিরোধী। ওটা একটা ধাপ্পা। তাই অস্ত্র ত্যাগ করবেন না।”^{১১৮} এ উক্তির মাধ্যমে উৎপল দত্তের এক ভিন্ন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে মতাদর্শ অহিংস মতের পরিপন্থী।

আবার ‘মানুষের অধিকারে’ নাটকে দেখা যায় হে উড চরিত্রের একটি সংলাপ উৎপল দত্তের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হে উডকে যারা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করতে চাইছে তাদের প্রতি হে-উড এর ভবিষ্যৎ বাণী—“আগে মরবে আমার হত্যাকারীরা প্রত্যেকে, তারপর মরবো আমি। যেদিন আমার সাক্ষীদের হাতে রাইফেল দেখা দেবে, সেদিন যে আমি আবার বেঁচে উঠবো —”^{১১৯}

এভাবে নিজস্ব মতাদর্শ, অনুভূতি, চেতনার মাধ্যমে উৎপল দত্ত অস্বাভাবিক ভবিষ্যৎকে নতুন করে গড়ার লক্ষ্যে সবকালীন যুগমানসের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে তাঁর নাটকে যে সংলাপের ব্যবহার তিনি করেছেন তা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের এক অভিনব সংযোজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নাট্যপ্রয়োগ : নাট্যপ্রয়োগ বা প্রযোজনার ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত ছিলেন স্বতন্ত্র এবং সার্বভৌম। নানা দেশে নানা কালের নাট্যপ্রথা বা বৃত্তি - প্রবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর জানার আগ্রহ ছিল।

তাই তিনি নানা দেশের নানা কালের নাট্যবিষয়কে কেন্দ্র করে যেমন নাটক রচনা করেছেন ঠিক তেমনি প্রযোজনার ক্ষেত্রেও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

কোন নাটকের মঞ্চে উপস্থাপনাকেই বলা হয় নাট্যপ্রয়োগ। নাটক যখন মঞ্চে প্রয়োগ হয় তখন সে নাটকটি আর শুধু মাত্র সাহিত্যের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তা অভিনয়, চিত্র, সংগীত, আলো ইত্যাদি শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বাঙ্গিক পূর্ণতম শিল্প রূপে আত্মপ্রকাশ করে। নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় উৎপল দত্তের নাটকগুলিও পূর্ণতম শিল্পরূপ লাভ করেছে।

নাটকের বিষয় নির্বাচন, সময় নির্বাচন, সংগীত, সংলাপ, পোশাক, হাসির উপাদান প্রভৃতি নাটক উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বাস্তবতাকে দর্শকের কাছে যাতে তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি খুব সহজেই বোধগম্য হয় সে জন্য তিনি যথাযথ চেষ্টা করেছেন। কল্লোল' নাটকের নৌবহরের মঞ্চায়ন, 'অঙ্গার' নাটকে কোলিয়ারির চিত্রায়ণ, 'এবার রাজার পালা' নাটকে আয়নার ভিতরে হিটলারের মূর্তির প্রতিবিশ্বাসন এ সমস্তকিছুর মাধ্যমে তিনি বাস্তবতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

“১৯৪৯ সালে এর ১৫ই জুলাই। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের শেষ দৃশ্যে যেখানে সিজারের পতনের পর মঞ্চজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত বিবেকবানদের যুদ্ধ। তৎকালীন ইতালীয় ফ্যাসিস্ট বর্বরতাকে তুলে ধরতে শেক্সপিয়ারকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র ফ্যাসিস্টদের পোশাক ব্যবহার করলেন। সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রায় সৌন্দর্যতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে সমসাময়িকতার আঙিনায় নিয়ে ফেললেন শেক্সপিয়ারকে। প্রতিবাদের এমন অভিনবত্ব উৎপল দত্তের আগে কিম্বা পরে এমনকি আজ, এখন পর্যন্ত আর কেউ নাটকে আনতে পারার মতো করে ভেবে দেখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।”^{১২০}

আবার ১৯৮২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরে গিরিশ ঘোষ রচিতি 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকটি অভিনয় কালে নাটকের শেষ দৃশ্যে একই প্রয়োগ লক্ষ্যকরা যায়।

“কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দৃশ্যে দেখা গেল লাইট মেশিন গান হাতে নিয়ে যোদ্ধার দল পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসকে বিন্দুমাত্র পৌরাণিকের খোলসে আটকে না রেখে একেবারে খোলাখুলি এসময়ের মধ্যে এনে ফেলতে, দর্শকের মনের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী চিন্তাকে উসকে দিতে এমন অসাধারণ সময়োচিত নাট্যভাবনা বাংলা নাটকের আগে কখনও কোনও দর্শক প্রত্যক্ষ করেননি। উৎপল দত্তের নাট্যচিন্তার গভীরতা ঠিক এখানেই।”^{১২১}

এছাড়াও সমকালীন পরিস্থিতির সমালোচনার ক্ষেত্রে ও তিনি বাস্তবের অনুসরণ করেছেন সেজন্য বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা কাহিনীকে অবলীলায় প্রয়োগ করেছেন তাঁর নাটকে।

“উৎপলীয় ধারায় নাটক সশস্ত্র বিপ্লবের হাতিয়ার, শেক্সপিয়রীয় অভিনয় রীতির গুণগত রূপান্তর ঘটিয়ে তিনি যে আপাত উচ্চগ্রাম বাঁধা ‘এপিক’ অভিনয় রীতির আত্মপ্রকাশ ঘটালেন তা সাধারণ ঘটনাবলীকেও করে তুলল অসাধারণ। প্রয়োগবিধ উৎপল দত্ত যেন ছাপিয়ে গেলেন অভিনেতা উৎপলকেও।”^{২২২}

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎপল দত্ত তাঁর অভিষ্ট সাধনের উপযোগী যুক্তি বিস্তার করেছেন। তিনি সমকালীন পরিস্থিতিকে যথাযথ তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সমালোচনা করার মাধ্যমে তাঁর মূল্যায়ন করেছেন। তাছাড়া সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন রয়েছে তাঁর নাটকগুলিতে। তাই বলা যায় উৎপল দত্তের নাটকগুলি প্রতিবাদের দলিল, তাঁর নাট্যপ্রয়োগের মাধ্যমে যেগুলি দর্শকের কাছে প্রতিবাদী চেতনার ইন্ধন যোগায়।

চরিত্র : নাট্য চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও উৎপল দত্ত প্রচারধর্মী ক্রটিকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাঁর নাটকের বেশ কিছু চরিত্রের মুখে তিনি যেন তাঁর নিজস্ব মতাদর্শের কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। মনে হয় চরিত্রগুলি যেন নিজের মতো করে কথা বলতে পারছে না। যেমন — ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের বেণী মাধব, মেথর, প্রিয়নাথ, চরিত্রগুলির বক্তব্য শুনলে মনে হয় তারা স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে না, যেন অন্যের ভাবনার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম মাত্র এরা।

কিন্তু শিল্পসম্মত নাটকের প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে গড়ে উঠে। যখন চরিত্রগুলি প্রত্যেকে নিজের কথা বলে; নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ করে তখন তাদের নিজস্ব রূপ উদ্ঘাটিত হয়।

অভিনেতা বা অভিনেত্রী নাট্যসংলাপের অর্থ ও ব্যঞ্জনা, আবৃত্তি বা উচ্চারণ-কৌশলে যদি প্রকাশ করতে না পারে তাহলে নাট্যচরিত্রের স্বরূপ ও তার অন্তরের রহস্য দর্শকের সামনে অপ্রকাশিত থেকে যায়। তাছাড়া নাট্যকারের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বক্তব্যও বিকৃতি লাভ করে।

তবে মুষ্টিমেয় দু’একটি চরিত্রের কথা বাদ দিলে উৎপল দত্তের নাট্য চরিত্রগুলি যথার্থ শিল্প নৈপুণ্যে স্বার্থক চরিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উৎপল দত্ত ছিলেন একজন প্রতিভাধর শিল্পী। তাই তিনি তাঁর বাচনিক কৌশলে নাট্য চরিত্রগুলিকে জীবন্ত বা সত্য করে তুলেছেন। তিনি

যথোপযুক্ত পরিচালনা ও নির্দেশনা এবং নাট্য চরিত্রগুলির সু-অভিনয়, সু-বাচন ভঙ্গির মাধ্যমে দর্শকের কাছে তাঁর বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও অনুভূতিকে স্পষ্ট সুন্দর ও অনুভবভেদ্য করে তুলতে পেরেছেন। নাট্যমঞ্চের প্রাণ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাধ্যমেই তিনি নাটকে বাস্তব রূপ দান করেছেন।

চরিত্রে এরকম নিজস্বতা-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব উন্মোচনকারী বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকের অশোক চরিত্রে। অশোক সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকে বিশ্বাস করে না তাই অন্য সকলের মতো শান্তিদা’র প্রস্তাব সে মেনে নিতে পারেনি। শুধু অশোকই নয় জ্যোতির্ময় চরিত্রটিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তার বক্তব্য থেকেই তাকে চেনা যায়—“এ রাজনীতি করেই হইতে পারে না। আমরা যে ম্যাকবেথ হইয়া গেলাম শান্তিদা- একটারে বাঁচাইতে আরেকটা তারপর আরেক। প্রথমে ডানকান, তারপর ব্যাঙ্কো, তারপর ম্যাকডাফের বউ। মহাকবি চিনছিল ঠিকই।”^{২১}

অশোক চরিত্রটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সে জানে যে দু’চারজন সাহেব খুন করলেই বিপ্লব আসেনা; দেশও স্বাধীন হয় না। বিপ্লবে সূর্যসেনের মতো একক নেতৃত্বে সে সন্দিহান। দেশের মানুষ যদি নিজের চেতনায় জেগে না ওঠে তাহলে প্রকৃত বিপ্লব সম্ভব নয়। অশোক যুক্তিবাদী, বিপ্লবী। হঠকারী রাজনীতিকে সে বিশ্বাস করে না। রাজনীতির উর্দে সে জীবনকেই ভালোবাসে। যা একজন জীবন প্রেমিকের ধর্ম, সব শিল্পীর কাছে সত্য। তাই নাটকের একেবারে অন্তিম পর্বে শান্তি রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে কেন সে গোপনে গভীর রাতে বাড়ি গিয়েছিল? উত্তরে সে বলে—“বিকজ্ লাইফ ইজ বিউটি ফুল!”^{২২} তাই অশোক চরিত্রটি উৎপল নাটকে সাহিত্যমূল্যের পরিচয় বাহক।

‘অঙ্গার’ নাটকে উৎপল দত্তের সমাজ দর্শনের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শেলডন কোলিয়ারির ম্যানেজার মিঃ দত্তঃ, বিচারক মিঃ সেন এবং গফুর প্রমুখ চরিত্রের শাসক-শোষক অত্যাচারী জীবন্ত প্রাণবন্ত রূপ। নাট্যকার এই চরিত্রগুলিকে তাদের কথায়-বার্তায় এবং আচার-আচরণে অত্যাচারী, কৌশলী ও ঘৃণার পাত্র করে তুলেছেন। আবার শট্ফায়ারার দীনু মুখার্জী, বিনোদ, সনাতন মণ্ডল, কুদরত, হাফিজ, রমজান প্রমুখ শ্রমিক চরিত্রের আশা-স্বপ্ন দুঃখ ও অত্যাচারের মধ্যে থেকে তাদের সংগ্রামী ঐক্য এবং শক্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টায় নাট্যকার সফল হয়েছেন।

কুদরত চরিত্রটি যখন শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলে—

“১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের কয়লাখনি আইনের ১৪৫ ধারায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে। খাদের গ্যাস বেড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মজুরকে উপরে তুলে আনতে হবে। কোম্পানী সে আইন মানেনি, তাই আপনারা নিজের থেকে বেড়িয়ে

এসে কোন বে-আইনি কাজ করেননি।”^{১২৫}

কুদরতের এই সংলাপে উৎপল দত্তের একজন শ্রমিক নেতার সংগ্রামী মনোভাব, মার্কসীয় চিন্তাভাবনার প্রকাশ পেলেও তাঁর শিল্পী সত্তাকে খুঁজতে হয় ভিন্ন চরিত্রে; যার অন্তঃস্থল থেকে অসতর্ক মুহূর্তে মার্কসীয় চিন্তা, বৈপ্লবিক আদর্শকে ছাপিয়ে বেড়িয়ে এসেছে আসল মানুষটি। তাই নাটকের শেষে সনাতন মণ্ডলের কণ্ঠে পৃথিবীর মানুষের প্রতি তার যে অস্তিম বাণী শোনা যায়, তা যে—

“নাট্যকারের কণ্ঠস্বর তাতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর পুঁজিপতিদের স্বার্থপরতা ও শয়তানি একদিকে, দরিদ্র নিঃস্ব সর্বহারা শ্রেণীর শয়তানদের হাতে করুণ মৃত্যু আর এক দিকে। শ্রেণীবৈষম্যের মূলে তিনি দেখেছেন ধনীর ধনলিপ্সা। এই ধনলিপ্সাই তাকে শয়তানে পরিণত করেছে। নাট্যকারের এই সরল জীবন দর্শনটি সনাতনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।”^{১২৬}

আবার জীবনের বিষামৃত পানে জীবনের যে প্রতিক্রিয়া তারই সন্ধান পাওয়া যায় বিনু নামক চরিত্রটিতে। দুঃখ-প্রেম-সংগ্রাম-আন্দোলন আশা-স্বপ্ন ভরা যে জীবন একান্ত আদরণীয় সেই জীবনআকৃতি প্রকাশিত হয়েছে বিনোদের সংলাপে।

রূপা নামক এক প্রতিবেশিনীকে নিয়ে তার স্বপ্ন, মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না, তার অন্তরে বিদ্রোহের আগুন। সব কিছুকে নিয়েই তার জীবন আকৃতি। জীবনকে সে ভালো বাসে। বস্তুর অন্তরালশায়ী সত্যকে সে দেখতে জানে। রূপার মনে যখন দৃঢ় ধারণা যে খনিতে যে ব্যক্তি নামে, তার আর কোন নিস্তার নাই। তার জবাবে বিনু জানায়—

“মোটাই না, বাজে কথা। কয়লা হোলো প্রস্তরীভূত শক্তি—কতযুগ আগে ওরা ছিল পৃথিবীর বুকের উপর, সূর্যের দিকে আকাশের দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, গভীর অরণ্যের রূপে। তারপর একদিন মুখ লুকোলো মটির তলায়—যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করল উত্তাপ, বজ্রের শক্তি, পৃথিবীর থেকে, সূর্যের কিরণ থেকে। চেহারা হোলো পোড়া, কালো, কর্কশ, ভেতরে রইল অগ্নি সন্তাবনা, ঠিক যেমন খেটে খাওয়া মানুষ। কেন সঞ্চয় করেছে জান? সেই সমস্ত সন্তাবনা যেন মানুষের হাতে হয়ে ওঠে অন্ধকারকে দূর করার মন্ত্র।”^{১২৭}

এ সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে উঠে বিনু তথা নাট্যকারের জীবন সত্যের উপলব্ধি।

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও বিনুর অন্তরে জাগরিত হয়েছে তার জীবনের প্রতি গভীর

ভালোবাসা, গভীর আসক্তির কথা। এক রাশ স্বপ্ন নিয়ে তার শেষ পর্যন্ত আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই রইল না। তাই তার স্বপ্ন পুরণে ব্যর্থতার জন্য মায়ের কাছে, বোনের কাছে, সে ক্ষমা চেয়েছে। জীবনের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে জীবন-প্রেমিকের এই আক্ষেপই জীবনপ্রেম। উৎপল দত্তের “মার্কসীয় তত্ত্ব দর্শন বিপ্লবের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে কবি অন্তর, মাইকেলের ভূমিকায় যাকে একাত্ম মনে হয়; মহাকবি শেক্সপিয়ার যার আদর্শ।”^{১২৮}

চরিত্র সৃষ্টিতে উৎপল দত্ত জার্মান নাট্যকার বার্টোল্ট ব্রেখ্টের মতো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে অনেকাংশে গ্রহণ করেছেন। ব্রেখ্টের নাট্যসংকলকদ্বয় র্যালফ ম্যানহিম এবং জন উইলেট সংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন—

“উৎপল দত্তও ব্রেখ্টের এই পদ্ধতি অনেকাংশে গ্রহণ করেছেন। নাট্য চরিত্রের মধ্যদিয়ে তিনি নানা শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিদের তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্বের অনুসরণে তাদের বৈপরীত্য সূচক আচার-আচরণের ও কথাবার্তার সাহায্যে নানা শ্রেণীর মানুষের মডেল তৈরী করতে চেয়েছেন, এ-সৎ, ও-অসৎ, এ-ভিলেন, ও-সাধু ইত্যাদি কোন মার্ক বা ছাপ তিনি তাঁর নাট্য চরিত্রের গায়ে মেরে দিতে নারাজ। মানুষরূপী নাট্য চরিত্রগুলির কথাবার্তা বা সংলাপে বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব থাকে বলে অনেক সময় অসংগতিমূলক মনে হতে পারে। কিন্তু যারা উৎপল দত্তের চিন্তা ভাবনায় ডায়ালেকটিক্স তত্ত্বের কথাটা মনে রাখেন, তাঁরা উৎপল দত্তের নাট্যচরিত্র ও সংলাপগুলিকে সেই তত্ত্বের নিরিখেই বিচার বিশ্লেষণ করেন।”^{১২৯}

সংগ্রামী ভারতের সংগ্রাম চেতনাকে উদ্বুদ্ধ রাখার বিবেক রূপে ‘কল্লোল’ নাটকের সাদুল সিং চরিত্রটি উৎপল দত্তের জীবনাদর্শ চরিত্র। ‘তিতুমীর’ নাটকের তিতুমীর চরিত্রটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। চরিত্র দুটি মার্কসীয় ডায়ালেক্টিকাল তত্ত্বের আদর্শেই রচিত।

শেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ কিংবা গিরিশচন্দ্রের নাট্য চরিত্রের মতো উৎপলের নাট্য চরিত্রগুলি জন্মসূত্র ধরে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ও আদর্শ নিয়ে স্বয়ম্ভূ হয়ে ওঠে না। নাট্যচরিত্রগুলি তাঁর নীতি আদর্শ ভিত্তিক হয়ে ওঠার জন্য তাদের সংলাপ ও নাট্যকারের ভাব-ভাবনা অনুসারীই হয়ে ওঠে। তবে উৎপল দত্তের নাট্য চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে মার্কসীয় ডায়ালেক্টিকাল তত্ত্বের আদর্শে যা সর্বদাই বিপরীতমুখী ভাব কল্পনা নিয়ে গড়ে উঠে।

‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে বেণীমাধব চরিত্রটি একাধারে নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা। ডায়ালেক্টিকাল তত্ত্বের ভিত্তিতে তার চরিত্র ও সংলাপ রচনার বিপরীতধর্মী গুণাগুণের সমাবেশে

নাট্যকারের শিল্প দক্ষতা প্রশংসার দাবী রাখে। এই বেণীমাধব চরিত্রটির আড়ালে লুকিয়ে আছেন যেন নাট্যকার নিজেই। সুতরাং নাট্যকারের অনুভূতি বা তাঁর সত্ত্বাকে খুঁজতে হবে বেণী চরিত্রের আড়ালে।

উৎপল দত্তের অন্তরে যে বিপ্লবের আগুন রয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে বেণীচরিত্রের ক্রিয়া কলাপে। নাটকের অন্তিম দৃশ্যে তাই দেখা যায় ‘নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন’ মেনে নিয়ে বেণী ‘সধবার একাদশী’ নাটকের অভিনয় করতে করতে হঠাৎ করে তিতুমীরের সংলাপ বলতে থাকেন। তলোয়ার চালাতে চালাতে বেণী বলেন—“এই নাও ইংরাজ দুসমন! এই নাও নারী ধর্ষক ইংরাজ হার্মাদ। আজ বছরের পর বছর আমার দেশেরে যা দিয়েছ, এই নাও তার খানিক ফেরৎ নাও!”^{১০০} বেণীর এই বৈপ্লবিক আগুন অন্তরের, বাইরে তিনি এ উগ্রতা কোথাও দেখান নি। এটা একধরনের শ্লেষাত্মক প্রকাশ।

উৎপল দত্তের নাটকে এরকম দু’একটি চরিত্র থাকেই যারা নাট্যকারের ভাব বক্তব্য নীতি আদর্শের অংশত ধারক এবং বাহক। যেমন ‘টিনের তলোয়ারে’র প্রিয়নাথ চরিত্রটি। একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শকে সামনে রেখে উৎপল দত্ত নাটকের জগতের যুগান্তর সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। প্রিয়নাথ চরিত্রটির কথাবার্তা শুনে মনে হয় হয় সে যেন উৎপল দত্তেরই ছায়া মাত্র। প্রিয়নাথ বেণীমাধবকে উদ্দেশ্য করে বলে—“আমি বহুদিন যাবৎ লক্ষ্য করেছি আপনাদের কদর্য জীবনবোধ বর্জিত নাটকের মিথ্যা আড়ম্বর। বাইরে পুরাতন সমাজ বিধবস্ত হচ্ছে নাট্যশালায়। আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের অলীক স্বর্গ রচনা করে চলেছেন।”^{১০১}

তাছাড়া ‘অঙ্গার’ নাটকের সনাতন মণ্ডল, ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকে জ্যোতির্ময় দেবব্রত প্রমুখ চরিত্রগুলিও উৎপল দত্তেরই ধ্যান ধারণার পরিচয় বাহক।

সংগীত : উৎপল দত্ত তাঁর নাটকগুলিতে যে গানের ব্যবহার করেছেন তা নাট্য চরিত্র ও নাট্য পরিস্থিতির সঙ্গে যথেষ্ট সুসংগত হয়েছে। নাট্যঘটনা বা নাট্যবিষয়ের সঙ্গে এ গানগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

নাটকে গান সাধারণত ব্যবহার করা হয় কোন ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য; দর্শককে এক ঘেয়েমি পরিবেশ থেকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য; সংলাপের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয় এমন বিষয়ের অবতারণার জন্য; নাট্যঘটনা বা নাট্যচরিত্রের কোন গোপন রহস্যের সন্ধানের জন্য; তাছাড়া নিছক আনন্দ দানের জন্যও গানের ব্যবহার হতে পারে।

সংগীত নাটকে নাট্যসংঘাত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। নাট্যঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাট্যসংগীত সংযোজিত হয়ে থাকে। অনেকসময় সঙ্গীতের মাধ্যমে দৃশ্য সন্নিবেশের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে

তোলা হয়। কখনো দার্শনিক মন্তব্য প্রকাশের জন্য, কখনো নাটকীয় রসকে ঘনীভূত করবার জন্য, আবার কখনো নাট্যঘটনায় উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য সংগীতের ব্যবহার করা হয়।

উৎপল দত্তের নাটকগুলিতে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে এবং নাট্যদ্বন্দ্বের মাঝে সংগীতের যথার্থ ও সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। নাট্যসংলাপ, নাট্যসংগীত এবং নাট্যবিষয়ের প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনুসঙ্গ নিয়ে নাট্যবিষয়বস্তু প্রকাশে, প্রয়োগের বিভিন্ন ভাবনার সঙ্গে মিলে নাট্যদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় ভাব ও রস সৃষ্টি হয়েছে। এবিষয়ে নাট্যতত্ত্ববিদ ও নাট্যসংগীতের ইতিহাসের পণ্ডিত স্বামীপ্রজ্ঞানন্দ তাঁর ‘নাট্যসংগীতের রূপায়ণ’ গ্রন্থে বলেছেন—“বিশেষ করে নাটকের বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার জন্য সংগীত তথা নাট্য সংগীতের প্রয়োজন। তাই কথার মাধ্যমে যে রস ও ভাবের প্রকাশ হয় না, সঙ্গীতের বিকাশ তাকে পূর্ণ করে।”^{১০২}

প্রথমে ‘তিনের তলোয়ার’ নাটকের গানগুলি সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। এ নাটকের গানে সে সময়ের সঙ্গীতের ধরণ প্রকাশে, সুরে এবং গায়কীতে সময়কে বোঝাতে বা বুঝাতে সাহায্য করে। আবার প্রতিবাদী ভাবনার ভাব এবং সংগ্রামের কথারও ইঙ্গিত রয়েছে। একই সঙ্গে যেন সত্তরের দশকের সেই উত্তাল সময়ের দেশ ও মানুষের হয়ে প্রতিবাদের সংগ্রামের আহ্বানের ইঙ্গিত রয়েছে। বিশেষ করে ‘স্বদেশ আমার’ ও ‘শুন গো ভারত ভূমি’ এই গান দুটি যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানায়। ইতিহাসকে ফিরে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ফেলে আসা সময়ের ইতিহাস ছুঁয়ে আর এক ঐতিহাসিক সময়ের বুক সজাগ দৃষ্টি রেখে শিল্পের প্রাঙ্গণ থেকে মানুষের জন্য মানুষকে আহ্বান জানায় সঙ্গীতে।

নাটকটির প্রথম দৃশ্যে যে গানটি রয়েছে—

“ছেড়ে কলকেতা বোন হবো পগার পার

পুঁজিপাটা চুলোয় গেল, পেট চালানো হল ভার।”^{১০৩}

উনিশ শতকীয় বাবু সংস্কৃতির যুগে সমাজ বাস্তবতার এক অবিস্মরণীয় গীতিরূপ হল এই গানটি। নাট্যপ্রয়োজনা বা নাট্যরচনায় সংলাপের মাধ্যমে যতটুকু বলা সম্ভব হচ্ছেনা অনেক সময় তা পূরণ করা হয় গানের মাধ্যমে। গানের মাধ্যমে নাট্য আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের সাহায্যে যা বলা হয় তাকে আরেকটু বেশী করে দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা করা হয় এবং তা সম্পূর্ণভাবে স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভরশীল। স্থান-কাল-পাত্র এ তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এ গানটি নাটকটিকে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠা দান করেছে।

আবার দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে যে গানটির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে —

“ওলো রাঙা বউ, তোরা কেউ কাগজ পড়িস লো

মন্দ ভালো সকল লোকের কেছা দেখিস লো।।”^{১৩৪}

এই গানটিকে গ্রেটবেঙ্গল অপেরার নাট্যচর্চা বিষয়ে পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমের ব্যঙ্গ বিদ্রুপকে গীতে রূপ দেওয়া হয়েছে। এ গানের মাধ্যমে এডিটর, সমালোচক এদের প্রতি ব্যঙ্গ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। যে কথাগুলি সংলাপে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় এবং সেটা শ্রুতি মধুরও হতনা। কিন্তু গানের মাধ্যমে বলাতে তা অল্প কথায় অনেক কথার সুন্দর ছবি আঁকা সম্ভব হয়েছে।

সে সময়ের বাবু কালচারের প্রতি একটা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় দৃশ্যে আরও একটি গানে—

সাচ্চা বুলি আমরা বলি, ভয় করিনা তাই।

বলবো দুটো নয়কো ঝুটো

রাগ করোনা ভাই।।^{১৩৫}

তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রতিভূ প্রিয়নাথের সঙ্গে বেণীমাধবের তর্কের একটা বিশেষ মুহূর্তে যখন সংলাপের দ্বারা তার নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। তখনই যদুর কণ্ঠে গানের সুরে সেই মুহূর্তের নাট্যদ্বন্দ্ব উদ্বেলিত হয়ে উঠে এ গানটির মাধ্যমে।

চতুর্থ দৃশ্যের—

দেশহিতৈষী বাবুরা সব মাথায় থাক।

তাদের রীতিনীতি চুলোয় যাক।^{১৩৬}

এ গানটির কথাগুলি একান্তই সময়োপযোগী হয়েছে। নাটকের ঠিক কোন সময়ে কথা বন্ধ রেখে শুধু গানের মাধ্যমে নাট্য দৃশ্যকে ভরিয়ে তোলা সম্ভব হবে নাট্যকার উৎপল দত্ত তা যাত্রা পালার কাছ থেকেই শিখেছেন। এ দৃশ্যে তাই ময়না, প্রিয়নাথ যখনই তাদের পোষাকের আচার আচরণের বাবুয়ানির হাতে নিজেদের বিবেকের স্বাস রোধ করতে চেয়েছে ঠিক তখনই এই যুবক এসে এই গান গেয়ে উঠেছে।

নাটকের সপ্তম দৃশ্যের শেষে যখন বেণীমাধব স্বতঃস্ফূর্ত চেতনায় দীনবন্ধুর নিমটাদ থেকে প্রিয়নাথের তিতুমীরে রূপান্তরিত হয়ে ডেপুটি কমিশনার ল্যান্সার্টের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংলাপ উচ্চারণ করেছেন ঠিক তখনই সার্থক ভাবে যদুর কণ্ঠে গীত হয়েছে মধুসূদন বিরোচিত দেশপ্রেমের একটি গান —

শুন গো ভারতভূমি

কত নিদ্রা যাবে তুমি

উঠ ত্যজ ঘুমঘোর

হইল, হইল ভোর

দিনকর প্রাচীতে উদয়।^{১৩৭}

গানটি গাওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে ওঠে স্বদেশ প্রেমের উচ্ছ্বাসে।

আবার ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকের শুরুতেই রয়েছে বিবেকের কণ্ঠে গাওয়া নজরুলের দেশাত্মবোধক গান—

কারার এই লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট

... ..

কে মালিক কে সে রাজা

দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি—

লাথি মার ভাঙরে তালা

যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।^{১৩৮}

ত্রিশের দশকে পরাধীন দেশের তারুণ্য শক্তির বিপ্লবী জেহাদ ঘোষিত হয়েছে এ গানটির মাধ্যমে। অত্যাচারী শাসক শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এতে। এগানটি প্রয়োগের মাধ্যমে নাট্যকারের প্রচার ধর্মিতাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পরিবেশে সমস্ত জনমানসের চেতনা জাগরণের জন্য এমন সতেজ উচ্ছ্বাসপূর্ণ গানের মাধ্যমে নাটক শুরু হওয়াতে নাট্যকার নাট্যদ্বন্দ্বকে বা নাট্যঘটনার গतिकে একটা বিশেষ রূপ প্রদান করতে পেরেছেন যা হয়তো অন্য কোন উপায় অবলম্বন করলে সম্ভব হতো না।

‘নীল রক্ত’ নাটকের প্রথম দৃশ্যে লোকেশ্বর ব্রত পালনের উৎসবে আসানগরের নারী-পুরুষ আনন্দে মেতেছে। দেশের সব দিকে যখন ইংরেজরা জোর করে দাদন দিয়ে নীল চাষ করাচ্ছে সে সময়েও আসানগরের জমিদারের কৃপায় চাষীরা নীল চাষের শোষণ থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাই তারা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে।

কিন্তু অন্যত্র সব জায়গাতেই নীল চাষ চলছে। নীল চাষের এই ভয়ঙ্করতার হাত থেকে আসানগরের মানুষও যে বেশিদিন রেহাই পাবে না তারও আভাস রয়েছে এই দৃশ্যের একটি গানে —

চলো যাই খেলতে যাব কেপ্টনগর বটতলা।

খেলতে খেলতে আসব দেখে নীলকুঠরি নীল তোলা।

... ..

এ গাঁয়ে মোরা বড় ভাগ্যবান

চারিদিকে নীলের শ্মশান।।

... ..

রং নয় ও চাষীর নীল রক্ত।।

ভাইরে চারিদিকে নীলের শ্মশান।^{১৩৯}

গানের কথার মাধ্যমেই জানা যায় যে ধান চাষের জমিতে ক্রমশ চলছে নীল চাষের ব্রিটিশ অগ্রাসন। ব্রিটিশদের এই আগ্রাসন তথা অশান্তির পরিবেশকে যথার্থ ভাবে দর্শকের সামনে হাজির করতে গিয়েই নাট্যকার এ গানটির প্রয়োগ দেখিয়েছেন, ‘নীল রক্ত’ নাটকটিতে।

‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ নাটকের শুরুতে যে গানটির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। তাতে নাট্যঘটনার গতি কী হতে পারে অর্থাৎ কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্য ঘটনা বিশ্লেষিত হবে তার পূর্বাভাস রয়েছে। শুধু তাই নয় এগানের মাধ্যমে নাট্যঘটনার সময়কালেরও প্রকাশ লক্ষণীয়। একটা বিশেষ সময়ে কোলকাতা নগরীতে পুঁজিপতিদের আগ্রাসন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সুখ-শান্তির আশ্রয় কোলকাতা নগরী এক বিশেষ সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা লাঞ্চিত হয়ে চলেছিল। গানের কথায় তার প্রকাশ —

আমার প্রিয়াকে আর কত দেবে গাল

কলঙ্কিনী বলে ডাকবে কত কাল?

... ..

প্রিয়া আমার নগ্ন আজিকে ধর্ষিতা কৃষগ ,

ক্ষুধায় ক্লিষ্ট ছিন্নভিন্ন মুখে তার তৃষণ,

কৌরবে আজ নিংড়ে নিচ্ছে রূপ-যৌবন-মান,

খুবলে খাচ্ছে দেহের মাংস রক্ত করছে পান।^{১৪০}

নাটকের শুরুতেই এ গানের মাধ্যমে নাট্যকার দর্শক-শ্রোতার মনে পুঁজিপতি বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণার সঞ্চার করে জনচেতনার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন।

এভাবে ‘এবার রাজার পালা’ নাটকের প্রস্তাবনা। অংশের —

চোরের পুত্র কি হয় সাধু

শিমুলে কি জন্মে মধু।।

... ..

চিনি হয় কি নিমের রসে

শ্বেতান্দ রাজা আবার ভালো হয়েছে কুত্র? ^{১৪১}

এগানটির মাধ্যমে শিল্পরসকে অক্ষুন্ন রেখে নাট্যকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি একটা চিরসত্য বিশ্বাস বা ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের মনের শুভ চেতনাকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন।

অনুরূপ ভাবে ‘তিতুমীর’ নাটকের প্রথম দৃশ্যে শত্রুঘ্ন দাসের কণ্ঠে গাওয়া —

ওরে গোলাম কিজাত

খালি খেয়ে খেয়ে লাথ

পড়ে থাকবি এই বুটের তলায়? ^{১৪২}

গানটির মাধ্যমে শোষিত, অত্যাচারিত মানুষের বিদেশীদের শাসন যন্ত্রের যাতা কলে পড়ে কীভাবে শুধু গোলাম হয়েই থাকে তার কথা যেমন বলা হয়েছে, ঠিক তেমনি এর পাশাপাশি এসব হীনবল মানুষদের মাথা উচু করে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবার সাজনের কণ্ঠে গাওয়া গানের মাধ্যমে জানা যায় যে কীভাবে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে শাসক শক্তি দেশের মানুষকে ধোকা দিচ্ছে।

থামো থামো ও বাপ ধিঙ্গি

আর ভাব পেড়ে লাভ নাই

বানিয়ে বোকা খাইয়ে ধোঁকা

খুব করেছ আশনাই।

ছুচ হয়ে তো ঢুকলে যাদু

এখন বেরুচ্ছ ফাল হয়ে।

কতকাল আর ও ফাঁকাচাল

থাকব বল সয়ে? ^{১৪৩}

শত্রুঘ্ন ও সাজন গাজীর পালা আকারে গান গাওয়ার মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর নাট্য উদ্দেশ্যকে কৌশলে জনতার সামনে হাজির করতে সফল হয়েছেন। তাছাড়া নাট্যঘটনার মধ্যে দেখা যায় এ পালা গানের আসরের মাধ্যমে শত্রুঘ্ন ও সাজন গাজী ছদ্মবেশে পরোক্ষ বিপ্লবীর ভূমিকাই পালন করেছে। শাসক শিবিরের গোপন খবর গানের মাধ্যমে এমন ভাবে বিপ্লবীদের কাছে প্রকাশ পেত যা তাদের পক্ষে ধরা সম্ভব হতোনা। এই পালাগানের মাধ্যমে যে বিষয়টিকে নাট্যকার অতিসহজেই নিপুনভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন অন্য কোন উপায়ে হয়তো তা সম্ভব হতোনা।

তাই বলা যেতে পারে উৎপল দত্তের নাটকে গানের ব্যবহার যে আবেদন সৃষ্টি করে তার

मध्ये नाट्यकारेण यथार्थ शिल्पदक्षतार परिचय निहित । अनेक समय कोन कोन गानेण प्रयोगे नाट्यकारेण नाट्य उद्देश्य किछुटा प्राधान्य पेयेछे । किञ्च से सामान्य प्रचारधर्मी त्रुटि विपुल परिमान जलराशि सम शिल्पनिपुणतार काछे एकटुकरो लवण गुडो छाडा आर किछुई नय । आलोच्य कयेकटि नाटकेण ए गानगुलि छाडाउ उंपल दन्तेण नाटकेण सकल गानेण स्फेद्रेई एकई कथा प्रयोज्य । नाट्यकार विभास चक्रवर्ती उंपल दन्तेण नाटकेण गान सम्पर्के बलेछेन—

“नाट्ये संगीत प्रयोगेण प्रथागत रीतिके तिनि भेङ्गे एक नतुन धारार प्रचलन करेछिलेन । संगीत सम्पर्के तार एई गभीर बोधेर जन्येई तार प्रयोजनागुलिण काठामो एत आकर्षनीय- गतिबेगे, चलने, हन्दे, वर्णे, आलोक छायाय, अभिनये अपूर्व से गठनशैली ।”^{१४४}

नाट्यद्वन्द्व ओ नाट्योत्कृष्टा : नाटकेण गति सृष्टि करार एकटि अन्यातम कौशल हल नाट्यद्वन्द्व तैरी करार । नाट्यद्वन्द्व बलते बोवाय नाट्यचरित्र वा व्यक्तिएण प्रतिकूल परिवेशेण सङ्गे अर्थां अपर एक वा एकाधिक व्यक्तिएण इच्छार सङ्गे बोवापडा वा व्यक्तिएण निजेरई भेतरकार प्रवृत्तिएण सङ्गे निवृत्तिएण लडाई । ए द्वन्द्व मूलतसमाज व्यवस्थाण सापेक्ष हय । नाट्यघटनाय नाट्य चरित्रगुलिण मध्ये ये घात प्रतिघातेण सृष्टि करार हय ताकेई नाट्यद्वन्द्व बला हय । एई नाट्यद्वन्द्वई हछे नाटकेण प्राण । नाट्यद्वन्द्व आवार नाना प्रकारे हते पारे । येमन—अतिप्राकृत शक्तिण सङ्गे व्यक्तिएण द्वन्द्व; एक व्यक्तिएण सङ्गे अपर आर एक व्यक्तिएण द्वन्द्व; समाज शक्तिण सङ्गे व्यक्ति शक्तिण द्वन्द्व; एकई चरित्रेण एक सन्तार सङ्गे अपर सन्तार द्वन्द्व वा अन्तर्द्वन्द्व ।

उंपल दन्तेण बेशिभाग नाटकेई एकटा निर्दिष्ट समाज व्यवस्थाण विरुद्धे एकटा निर्दिष्ट आदर्शेण द्वन्द्व रयेछे । धनताम्रिक वा बूर्जेया समाजव्यवस्थाण विरुद्धे मार्क्सवादी आदर्शेण लडाई । समाज व्यवस्थाके परिवर्तन करे एकटा निर्दिष्ट आदर्शेण द्वारा तैरि समाज वा राष्ट्र व्यवस्थाण प्रतिस्थापन चेयेछिलेन नाट्यकार उंपल दन्त । सेदिक थेके बला याय ये उंपलेण बेशिण भाग नाटकेई रयेछे समाज व्यवस्थाण सङ्गे व्यक्तिएण द्वन्द्व । किञ्च एई व्यक्तिएण द्वन्द्वके निहक एकजन व्यक्ति मात्रेण द्वन्द्व भाबले चलबे ना । मार्क्सवादी आदर्शे-विश्वासी-एमन व्यक्तिकेई बोवानो हयेछे बला याय ।

“समाजतन्त्रेण आदर्शे विश्वासी यारा तारा पूंजिवादेण सर्वनाशा नागपाश थेके गणजीवनके मुक्त करवार चेष्टा करेछे वटे किञ्च पूंजिपतिदेण चक्राङ्गे तादेण संकल्प एखनओ कार्ये परिणत हते पारछे ना । अति आधुनिक नाटके एई द्वन्द्वेण विचित्र रूप उपस्थापित हछे ।”^{१४५}

নাট্যকার উৎপল দত্তের নাটকগুলিতে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্যদ্বন্দ্বের প্রয়োগ রয়েছে। নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির পাশাপাশি নাট্যোৎকর্ষাও সৃষ্টি করেছেন উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যঘটনার মধ্যে। নাট্যোৎকর্ষা সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি দর্শকদের নাট্যঘটনার কিছুটা জানিয়েছেন, আবার কিছুটা জানতে দেননি। এই অজানা অংশটুকু জানবার জন্যই দর্শকের মনের মধ্যে আগ্রহ ও উত্তেজনা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি দর্শকের মনকে বিলম্বিত ক্রিয়ার মধ্যে খেলাতে পেরেছেন এবং দর্শকের মনে নাট্যোৎকর্ষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

শোষণ বা শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের দৃশ্যগুলি তিনি এত নির্মমভাবে চিত্রিত করেছেন যে দর্শক মনে শ্বাসরোধকারী উৎকর্ষা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকে মার্কিন সেনাপতি হুইলার ও নাইট অত্যাচারী চরিত্র দুটির ড. ভিন ও নার্স মাও এর উপর নির্ধূর ভাবে শারীরিক অত্যাচার চালানোর দৃশ্য দর্শক মনে প্রবল উৎকর্ষা সৃষ্টি করে। নাটকে দেখা যায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মার্কসবাদে বিশ্বাসী কাস্ত্রো কাহিনীর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। ‘নীল রক্ত’ নাটকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষিজীবী শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, ‘তিতুমীর’ নাটকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় জমিদার তথা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। এসব নাটকের কাহিনীর মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে দর্শক মনে কৌতুহল এবং উত্তেজনা জাগিয়ে তুলেছেন নাট্যকার।

এছাড়াও ‘টিনের তলোয়ার’ ব্যারিকেড’ ‘সূর্যশিকার’, দুঃস্বপ্নের নগরী’, ‘এবার রাজার পালা’, ‘অঙ্গার’, ‘ফেরারী ফৌজ’, ‘কল্লোল’ প্রভৃতি নাটকের কাহিনীতেও দেখা যায় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মার্কসীয় মতাদর্শের সংঘাত বা দ্বন্দ্ব। নাট্যকার তাঁর শিল্পনিপুণতার সঙ্গে এই নাটকগুলির কাহিনীতে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর নাট্য উদ্দেশ্য থাকলেও শিল্পগুণের কোন ঘাটতি ঘটতে দেননি।

‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকে অশোক নামক বিপ্লবী চরিত্রটিকে পুলিশ যখন ধরে নিয়ে যায় তখন পুলিশের ডেরায় তাকে নির্মম ভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়। মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে অশোক। ডাক্তার বারবার তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত বেহুশ হয়ে তাদের নেতা শাস্তিদাকে উদ্দেশ্য করে নানা ধরণের অসংলগ্ন কথা বলে। অশোকের কাছ থেকে তাদের সংগঠনের গোপন খবর জানবার জন্য আরো এক ধাপ এগিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করে পুলিশ অফিসার হিতেন দাসগুপ্ত। অশোকের স্ত্রীকে ধরে এনে তার সামনেই ধর্ষণ করা হয়। এমন ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা মার্কস শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি দর্শক মনে প্রবল নাট্যোৎকর্ষা সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক।

এরকম অত্যাচারের দৃশ্যে প্রায় প্রতিটি নাটকেই তীব্র নাট্যোৎকর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে নাট্যকাহিনীর গতিবেগ তীব্রতর তৈরিতে পারঙ্গম হয়েছেন নাট্যকার উৎপল দত্ত। এতে তাঁর নাটকগুলি একটি আলাদা মাত্রা লাভ করেছে।

এছাড়া নাট্যঘটনায় আকস্মিকতা বা নাটকীয় চমক সৃষ্টিতেও তিনি সফল হয়েছেন। ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকের নাট্যকাহিনীতে দেখা যায় লানহু চরিত্রটি এতদিন মার্কিন বাহিনীকে সহযোগীতা করে এসেছে। কিন্তু নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায় লানহু আসলে মার্কিনদের শত্রু নেতা ব্রাক। আবার ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকে দেখা যায় একটি চরিত্র নীলমনি। এতদিন যে ব্রিটিশ পুলিশকে শান্তিদার দলের গোপন খবর দিয়ে এসেছে অর্থাৎ লিংকম্যানের কাজ করে ব্রিটিশ পুলিশের আস্থা ভাজন ছিল, নাটকের নবম বা শেষ দৃশ্যে দেখা যায় এই নীলমনির ছদ্মবেশে আসলে অনুশীলন সমিতির নেতা শান্তিরায় নিজের দলের নাশকতামূলক কাজের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে থেকে তাদের গোপন খবর জানতে চেষ্টা করেছেন। একসময় পুলিশ তাঁর আসল রূপ জানতে পারে। ফলে স্টীমারের ডগের পাশে মধ্যরাত্রে পুলিশের গুলিতে শান্তিদাকে শহীদ হতে হয়। এভাবেই তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটকে নাটকীয় চমক বা নাট্যঘটনায় আকস্মিকতা তৈরী করে একজন দক্ষনাট্যকার হিসেবে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

মতাদর্শে উৎপল দত্ত মার্কসবাদকে গ্রহণ করলেও এ মতাদর্শকে প্রয়োগ করে নাটকের ফর্ম হিসেবে তিনি ইবসেন, শেক্সপিয়ার, ব্রেখ্ট প্রমুখ নাট্যকারের নাটকীয় রীতি অনুসরণ করেছেন।

নাট্যবৃত্ত গঠনের ক্ষেত্রে তিনি নাট্যঘটনার আদি-মধ্য-অন্ত স্তরের মধ্যে যোগ সংস্থাপন রক্ষা করেছেন। পরপর নাট্যস্তরের মধ্য দিয়ে নাট্যবৃত্তকে বিকশিত করে তুলেছেন এবং সুপরিণতি প্রদান করেছেন। নাটকে নাট্যদ্বন্দ্ব, নাট্যোৎকর্ষ সৃষ্টির পাশাপাশি নাট্যশ্লেষ রচনাতেও যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন তিনি।

নাটককে সাহিত্য হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি প্রচার বা উদ্দেশ্যের চেয়ে সাহিত্যমূল্যের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উৎপল দত্ত নাটককে তাঁর মতাদর্শের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবাদের হাতিয়ার করেছিলেন তাই তাঁর মতাদর্শকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে গিয়ে অনেক সময় নাট্যঘটনায় সামান্য প্রচার ধর্মিতা দেখা গেলেও সাহিত্যধর্মিতা থেকে তিনি কখনোই সরে আসেননি, উপরের আলোচনা থেকে একথা বলা যেতে পারে। নাটককে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন করতে যে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার সে সবই তিনি যত্ন সহকারে করেছেন এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের জগতে একজন সফল নাট্যকার হিসেবে উন্নীত হতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার, প্যাপিরাস, কোল-০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ১২।
২. তদেব, পৃ. ১২।
৩. শর্মীক বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, ভূমিকা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৯, পৃ. xii।
৪. তদেব, পৃ. xii।
৫. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ১৩২।
৬. তদেব, পৃ. ১৪০।
৭. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ২৯৬।
৮. পশ্চিমবঙ্গ, উৎপলদত্তের স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৭।
৯. পবিত্র সরকার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৬, পৃ. ০৫।
১০. উৎপল দত্ত, জপেন দা জপেন যা, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ- ১, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ. ১২৫।
১১. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৬২।
১২. পবিত্র সরকার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৬, পৃ. ০৮।
১৩. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার, প্যাপিরাস, কোল-০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ১৩।
১৪. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৬১।
১৫. তদেব, পৃ. ৫৬৪।

১৬. তদেব, পৃ. ৫৭৮।
১৭. তদেব, পৃ. ৫৮১।
১৮. পবিত্র সরকার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৩।
১৯. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৬৪।
২০. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার, প্যাপিরাস, কোল-০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ১২।
২১. তদেব, পৃ. ১২।
২২. নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ১১৪।
২৩. তদেব, পৃ. ১১৫।
২৪. তদেব, পৃ. ১১৫।
২৫. তদেব, পৃ. ১১৬।
২৬. তদেব, পৃ. ১১৬।
২৭. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৭১।
২৮. তদেব, পৃ. ১১৯।
২৯. নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ১৮৭।
৩০. সাক্ষাৎকার : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.০৮.১৯৮৮।
৩১. থিয়েটারে উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গণশক্তি, ০২.০৯.১৯৯৩।
৩২. হীরেন ভট্টাচার্য, বাংলার রাজনৈতিক নাটক ও উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ১৯০।
৩৩. উৎপল দত্ত, জনপ্রিয়তা ও আলমগীর, চায়ের ধোঁয়া, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৪৬।
৩৪. তদেব, পৃ. ৪৯।
৩৫. তদেব, পৃ. ৪৭।

৩৬. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ১১।
৩৭. উৎপল দত্ত, 'রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ', জাপেন দা জাপেন যা, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশার্স, কোল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২২৬।
৩৮. তদেব, পৃ. ২২৬।
৩৯. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ৪৪৮।
৪০. শোভা সেন, স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৮২।
৪১. উৎপল দত্ত, 'রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ', জাপেন দা জাপেন যা, গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ. ২২৯।
৪২. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ৪৫৩।
৪৩. শোভা সেন, স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৪৫।
৪৪. উৎপল দত্ত, 'অঙ্গার' উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ১২৫।
৪৫. তদেব, পৃ. ১৩৩।
৪৬. তদেব, পৃ. ১৩৯।
৪৭. তদেব, পৃ. ১৪১।
৪৮. তদেব, পৃ. ১৪৩।
৪৯. তদেব, পৃ. ১৪৩।
৫০. তদেব, পৃ. ১৪৪।
৫১. তদেব, পৃ. ১৪৪।
৫২. শোভা সেন, স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৪৬।
৫৩. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ৪৫৩।

৫৪. তদেব, পৃ. ৪৫৪।
৫৫. উৎপল দত্ত, ফেরারী ফৌজ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ১৬৫।
৫৬. তদেব, পৃ. ২২৭।
৫৭. তদেব, পৃ. ১৮২।
৫৮. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ৪৫৬।
৫৯. তদেব, পৃ. ৪৫৭।
৬০. তদেব, পৃ. ৪৭।
৬১. W.H. Hudson, An Introduction to the study of literature, Radha Publishing House, Kolkata, p. 199.
৬২. উৎপল দত্ত, 'কল্লোল', উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ২৯৬।
৬৩. তদেব, পৃ. ২৬৩।
৬৪. তদেব, পৃ. ৩১১।
৬৫. নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ৩৭৪।
৬৬. তদেব, পৃ. ৩৭৪।
৬৭. উৎপল দত্ত, মানুষের অধিকারে, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০০৭, পৃ. ৭১।
৬৮. তদেব, পৃ. ৭৫।
৬৯. তদেব, পৃ. ৮১।
৭০. তদেব, পৃ. ৮৪।
৭১. তদেব, পৃ. ৯৪।
৭২. নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ৩৭৪।
৭৩. উৎপল দত্ত, মানুষের অধিকারে, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০০৭, পৃ. ১৩৬।

৭৪. তদেব, পৃ. ১৩৭।
৭৫. তদেব, পৃ. ১৩৭।
৭৬. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ৪৫৫।
৭৭. তদেব, পৃ. ৪৫২।
৭৮. তদেব, পৃ. ৪৫৫।
৭৯. উৎপল দত্ত, প্রপেসর মামলক, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড, কোল-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০০৭, পৃ. ৩৮৯।
৮০. তদেব, পৃ. ৩৮৮।
৮১. তদেব, পৃ. ৩৯২।
৮২. তদেব, পৃ. ৩৯২।
৮৩. তদেব, পৃ. ৩৯৩।
৮৪. তদেব, পৃ. ৩৯৩।
৮৫. তদেব, পৃ. ৪০০।
৮৬. তদেব, পৃ. ৪০১।
৮৭. তদেব, পৃ. ৪০২।
৮৮. তদেব, পৃ. ৪০৪।
৮৯. উৎপল দত্ত, ব্যারিকেড, প্রস্তাবনা, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড, কোল-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ২১৯।
৯০. তদেব, পৃ. ২২২।
৯১. তদেব, পৃ. ২৪১।
৯২. তদেব, পৃ. ২৭৮।
৯৩. ড. চিত্তরঞ্জন লাহা, বাংলা নাটকের টেকনিক, ভট্টাচার্য ব্রাদার্স, ৩০/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, প্রথম
প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ. ৮৫।
৯৪. দর্শন চৌধুরী, গণনাট্যের নবান্ন : পুনর্মূল্যায়ণ, বামা পুস্তকালয়, কোলকাতা-৭৩, আগস্ট, ১৯৯৭, পৃ.
৯৯।
৯৫. ড. অজিত কুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, কলকাতা- ০৬, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি
২০০৬, পৃ. ১২২।

৯৬. উৎপল দত্ত, ফেরারী ফৌজ, প্রথম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৫১।
৯৭. ঐ, পৃ. ১৫১।
৯৮. ঐ, পৃ. ১৫১।
৯৯. ড. অজিত কুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, কোলকাতা-০৬, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ,
ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃ. ১৫।
১০০. উৎপল দত্ত, 'বণিকের মানদণ্ড', 'প্রাক্কথন' অংশ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৫৫৯।
১০১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ, কোলকাতা-০৬,
ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৩৬।
১০২. অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যসংলাপ ঃ মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, বুকসওয়ে, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ,
১লা জানুয়ারী-২০০৯, পৃ. ৭১।
১০৩. তদেব, পৃ. ৬৯।
১০৪. তদেব, পৃ. ৩।
১০৫. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ৭৮।
১০৬. অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যসংলাপ ঃ মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, বুকসওয়ে, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ,
১লা জানুয়ারী-২০০৯, পৃ. ১৩৮।
১০৭. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ, ১৪১১, পৃ. ৮০।
১০৮. তদেব, পৃ. ৯২।
১০৯. তদেব, পৃ. ৮০।
১১০. তদেব, পৃ. ১২৭।
১১১. চন্দন সেন, 'উৎপলীয় সংলাপ ঃ যেন খাপছাড়া খোলা তলোয়ার', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক
অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-
৭৩, পৃ. ২৮৭।
১১২. উৎপল দত্ত, ফেরারী ফৌজ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
কোলকাতা-৭৩, ৪র্থ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৬৪।

১১৩. চন্দন সেন, 'উৎপলীয় সংলাপ : যেন খাপছাড়া খোলা তলোয়ার', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোগ্রন্থ ২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ২৮৭।
১১৪. তদেব, পৃ. ২৮৭।
১১৫. তদেব, পৃ. ২৮৭-২৮৮।
১১৬. তদেব, পৃ. ২৮৮।
১১৭. উৎপল দত্ত, 'কৃপাণ', উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ৬১১।
১১৮. উৎপল দত্ত, 'কল্লোল', উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ২৯৯।
১১৯. উৎপল দত্ত, মানুষের অধিকারে, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ১৩৬-১৩৭।
১২০. 'পশ্চিমবঙ্গ', উৎপল দত্ত, স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৭৭।
১২১. তদেব, পৃ. ১৭৭।
১২২. তদেব, পৃ. ১৭৩।
১২৩. তদেব, পৃ. ২১৯।
১২৪. তদেব, পৃ. ২২৮।
১২৫. উৎপল দত্ত, অঙ্গার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১০২।
১২৬. অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যসংলাপ : মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, প্রথম প্রকাশ, বুকসওয়ে, কোলকাতা-৭৩, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ১৩৩।
১২৭. উৎপল দত্ত, অঙ্গার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১০৮।
১২৮. অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যসংলাপ : মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, প্রথম প্রকাশ, বুকসওয়ে, কোলকাতা-৭৩, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ১৩৪।
১২৯. তদেব, পৃ. ১৩৫।

১৩০. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ, ১৪১১, পৃ.১৪১।
১৩১. তদেব, পৃ. ৯২।
১৩২. নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ২৩৬।
১৩৩. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮০।
১৩৪. তদেব, পৃ. ৮২।
১৩৫. তদেব, পৃ. ৯৬।
১৩৬. তদেব, পৃ. ১১৭
১৩৭. তদেব, পৃ. ১৪১।
১৩৮. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ১৫১-১৫২।
১৩৯. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০০, পৃ. ৮২-৮৩।
১৪০. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ৭৯।
১৪১. তদেব, পৃ. ২২৯-২৩০।
১৪২. তদেব, পৃ. ৩১২।
১৪৩. তদেব, পৃ. ৩১২।
১৪৪. বিভাস চক্রবর্তী, উৎপল দত্ত ঃএক মহান শিক্ষক, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ.২২৪।
১৪৫. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ৯৪।